আল মু'মিন

৪০

নামকরণ

সূরার ২৮ আয়াতের وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ অংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটা সে সূরা যার মধ্যে সেই বিশেষ মু'মিন ব্যক্তির উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, এ সূরা সূরা যুমার নাযিল হওয়ার পর পরই নাযিল হয়েছে। কুরআন মজীদের বর্তমান ক্রমবিন্যাসে এর যে স্থান, নাযিল হওয়ার ধারাক্রম অনুসারেও সূরাটির সে একই স্থান।

নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট

যে পটভূমিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিলো এর বিষয়বস্তুর মধ্যে সেদিকে সুস্পষ্ট ইংগিত বিদ্যমান। সে সময় মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দুই ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এক, বাক–বিতণ্ডা ও তর্ক–বিতর্ক সৃষ্টি করে নানা রকমের উল্টা–পাল্টা প্রশ্ন উত্থাপন করে, এবং নিত্য নতুন অপবাদ আরোপ করে কুরআনের শিক্ষা, ইসলামী আন্দোলন এবং খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মানুষের মনে এমন সন্দেহ সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেয়া যে, তা খণ্ডন করতেই যেন নবী (সা) ও ঈমানদারগণ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো। একবার তারা কার্যত এ পদক্ষেপ নিয়েও ফেলেছিলো। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আস (রা) বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হারাম শরীফের মধ্যে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ 'উকবা ইবনে আবু মু'আইত অগ্রসর হয়ে তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে দিল। অতপর তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার জন্য কাপড়ে মোচড় দিতে লাগলো। ঠিক সে মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ধাক্কা মেরে 'উকবা ইবনে আবু মু'আইতকে হটিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর যে সময় ধাক্কা দিয়ে ঐ জালেমকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলো, اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ (তোমরা কি শুধু এতটুকুন অপরাধে একজন মানুষকে হত্যা করছো যে, তিনি বলছেন, আমার রব আল্লাহ?) এ ঘটনাটি

সীরাতে ইবনে হিশাম গ্রন্থেও কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নাসায়ী ও ইবনে আবী হাতেমও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

বক্তব্যের শুরুতেই পরিস্থিতির এ দু'টি দিক পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট গোটা বক্তব্যই এ দু'টি দিকের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ পর্যালোচনা মাত্র।

হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমানদার ব্যক্তির কাহিনী শুনানো হয়েছে (আয়াত ৩৩ থেকে ৫৫) এবং এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে তিনটি গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে ঃ

এক ঃ কাফেরদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যা কিছু করতে চাচ্ছো ফেরাউন নিজের শক্তির ওপর ভরসা করে হযরত মূসার (আ) সাথে এমন একটা কিছুই করতে চেয়েছিলো। একই আচরণ করে তোমরাও কি সে পরিণাম ভোগ করতে চাও যা তারা ভোগ করেছিলো?

দুই ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এসব জালেম দৃশ্যত যত শক্তিশালী ও অত্যাচারীই হোক না কেন এবং তাদের মোকাবিলায় তোমরা যতই দুর্বল ও অসহায় হওনা কেন, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত, যে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য তোমরা কাজ করে যাচ্ছো তাঁর শক্তি যে কোন শক্তির তুলনায় প্রচণ্ডতম। সুতরাং তারা তোমাদের যত বড় ভীতিকর হুমকিই দিক না কেন তার জবাবে তোমরা কেবল আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নাও এবং তারপর একেবারে নির্ভয় হয়ে নিজেদের কাজে লেগে যাও। আল্লাহর পথের পথিকদের কাছে যে কোন জালেমের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের একটিই জবাব, আর তা হচ্ছে ঃ

اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

এভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিপদ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যদি কাজ করো তাহলে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য অবশ্যই লাভ করবে এবং অতীতের ফেরাউন যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে বর্তমানের ফেরাউনও সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সে সময়টি আসার পূর্বে জুলুম-নির্যাতনের তুফান একের পর এক যতই আসুক না কেন তোমাদেরকে তা ধৈর্যের সাথে বরদাশত করতে হবে।

তিন ঃ এ দু'টি গোষ্ঠী ছাড়াও সমাজে তৃতীয় আরেকটি গোষ্ঠী ছিল। সেটি ছিল এমন লোকদের গোষ্ঠী যারা মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছিলো যে, ন্যায় ও সত্য আছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে আর কুরাইশ গোত্রের কাফেররা নিছক বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও তারা হক ও বাতিলের এ সংঘাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলো। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বিবেককে নাড়া দিয়েছেন। তিনি তাদের বলছেন, ন্যায় ও সত্যের দুশমনরা যখন তোমাদের চোখের সামনে এত বড় নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও যদি তোমরা বসে

বসে তামাসা দেখতে থাকো তাহলে আফসোস। যে ব্যক্তির বিবেক একেবারে মরে যায়নি তাদের কর্তব্য ফেরাউন যখন মূসাকে (আ) হত্যা করতে চেয়েছিলো তখন তার ভরা দরবারে সভাসদদের মধ্য থেকে একজন ন্যায়পন্থী ব্যক্তি যে ভূমিকা পালন করেছিলো সে ভূমিকা পালন করা। যে যুক্তি ও উদ্দেশ্য তোমাদেরকে মুখ খোলা থেকে বিরত রাখছে সে একই যুক্তি ও উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তির সামনে পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু সে أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ (আমার সব বিষয় আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলাম) বলে সমস্ত যুক্তি ও উদ্দেশ্যকে পদাঘাত করেছিলেন। কিন্তু দেখো, ফেরাউন তার কিছুই করতে পারেনি।

ন্যায় ও সত্যকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য পবিত্র মক্কায় রাতদিন কাফেরদের যে তর্ক–বিতর্ক ও বাক–বিতণ্ডা চলছিলো তার জবাবে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যকার মূল বিবাদের বিষয় তাওহীদ ও আখিরাতের আকীদা বিশ্বাসের যথার্থতা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে এবং এ সত্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এসব লোক কোন যুক্তি–প্রমাণ ছাড়াই খামখা সত্যের বিরোধিতা করছে। অপর দিকে কুরাইশ নেতারা এতটা তৎপরতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলো কেন সে কারণগুলোকে উন্মোচিত করা হয়েছে। বাহ্যত তারা দেখাচ্ছিলো যে, নবীর (সা) শিক্ষা এবং তাঁর নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে তাদের বাস্তব আপত্তি আছে যার কারণে তারা এসব কথা মেনে নিতে পারছে না। তবে মূলত তাদের জন্য এটা ছিলো ক্ষমতার লড়াই। কোন রাখঢাক না করে ৫৬ আয়াতে তাদেরকে পরিষ্কার একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের অস্বীকৃতির আসল কারণ তোমাদের গর্ব ও অহংকার যা দিয়ে তোমাদের মন ভরা। তোমরা মনে করো মানুষ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত মেনে নেয় তাহলে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকবে না। এ কারণে তাঁকে পরাস্ত করার জন্য তোমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো।

এ প্রসংগে কাফেরদেরকে একের পর এক সাবধান করা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করা থেকে বিরত না হও তাহলে অতীতের জাতিসমূহ যে পরিণাম ভোগ করেছে তোমরাও সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবে এবং আখিরাতে তোমাদের জন্যে তার চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণাম ভাগ্যের লিখন হয়ে আছে। সে সময় তোমরা অনুশোচনা করবে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না।

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِي الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝

হা–মীম। এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত যিনি মহাপরাক্রমশালী, সবকিছু সম্পর্কে অতিশয় জ্ঞাত, গোনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং অত্যন্ত দয়ালু। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।[১]

আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে কেবল সে সবলোকই বিতর্ক[২] *সৃষ্টি করে যারা কুফরী করেছে*[৩] *এরপরও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে তাদের চলাফেরা যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।*[৪]

১. এটা বক্তব্যের ভূমিকা। এর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই শ্রোতাদেরকে এ মর্মে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সামনে যে বাণী পেশ করা হচ্ছে তা কোন সাধারণ সত্তার বাণী নয়, বরং তা নাযিল হয়েছে এমন আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি এসব গুণাবলীর অধিকারী। এরপর একের পর এক আল্লাহ তা'আলার কতিপয় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যা পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত ঃ

প্রথম গুণটি হচ্ছে তিনি পরাক্রমশালী বা সর্বশক্তিমান অর্থাৎ সবার ওপরে বিজয়ী। কারো ব্যাপারে তিনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন তা নিশ্চিতভাবেই কার্যকরী হয়। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ বিজয়ী হতে পারে না। কিংবা কেউ তাঁর পাকড়াও থেকেও বাঁচতে পারে না। তাই তাঁর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেউ যদি সফলতার আশা করে এবং তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তাঁকে পরাভূত ও অবদমিত দেখানোর আশা

করে, তাহলে তা তার নিজের বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের আশা কখনো পূরণ হতে পারে না।

দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে, তিনি সবকিছু জানেন। অর্থাৎ তিনি অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা বলেন না, বরং তিনি প্রতিটি বস্তু সম্পর্কেই সরাসরি জ্ঞানের অধিকারী। এ জন্য অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ে তিনি যেসব তথ্য দিচ্ছেন কেবল সেগুলোই সঠিক হতে পারে এবং তা না মানার অর্থ হচ্ছে অযথা অজ্ঞতার অনুসরণ করা। একইভাবে তিনি জানেন কোন্ জিনিসে মানুষের উন্নতি এবং তার কল্যাণের জন্য কোন্ নীতিমালা, আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ আবশ্যক। তাঁর প্রতিটি শিক্ষা সঠিক কৌশল ও জ্ঞান-ভিত্তিক যার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব, তাঁর পথনির্দেশনা গ্রহণ না করার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি নিজেই তার ধ্বংসের পথে চলতে চায়। তাছাড়া মানুষের কোন গতিবিধি তাঁর নিকট গোপন থাকতে পারে না। এমনকি মনের যে নিয়ত ও ইচ্ছা মানুষের সমস্ত কাজ-কর্মের মূল চালিকাশক্তি তাও তিনি জানেন। তাই কোন অজুহাত বা বাহানা দেখিয়ে মানুষ তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

তৃতীয় গুণ হচ্ছে, "গোনাহ মাফকারী ও তাওবা কবুলকারী" এটা তাঁর আশা ও উৎসাহ দানকারী গুণ। এ গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা এখনো পর্যন্ত বিদ্রোহ করে চলেছে তারা যেন নিরাশ না হয় বরং একথা ভেবে নিজেদের আচরণ পুনর্বিবেচনা করে যে, এখনো যদি তারা এ আচরণ থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। এখানে একথা বুঝে নিতে হবে যে, গোনাহ মাফ করা আর তাওবা কবুল করা একই বিষয়ের দু'টি শিরোনাম মোটেই নয়। অনেক সময় তাওবা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা গোনাহ মাফ করতে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি ভুল-ত্রুটিও করে আবার নেকীর কাজও করে এবং তার নেকীর কাজ গোনাহ মাফ হওয়ার কারণ হয়ে যায়, চাই ঐ সব ভুল-ত্রুটির জন্য তার তাওবা করার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ হোক বা না হোক। এমনকি সে যদি তা ভুলে গিয়ে থাকে তাও। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তির ওপর যত দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি এবং নানা রকম দুশ্চিন্তা ও মর্মপীড়াদায়ক বিপদাপদই আসে তা সবই তার গোনাহ ও ভুল-ত্রুটির কাফ্ফারা হয়ে যায়। এ কারণে গোনাহ মাফ করার কথা তাওবা কবুল করার কথা থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাওবা ছাড়াই গোনাহ মাফলাভের এ সুযোগ কেবল ঈমানদারদের জন্যই আছে। আর ঈমানদারদের মধ্যেও কেবল তারাই এ সুযোগ লাভ করবে যারা বিদ্রোহ করার মানসিকতা থেকে মুক্ত এবং যাদের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েছে, অহংকার ও বার বার গোনাহ করার কারণে নয়।

চতুর্থ গুণ হচ্ছে, তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। এ গুণটি উল্লেখ করে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, বন্দেগী ও দাসত্বের পথ অনুসরণকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যতটা দয়াবান, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার আচরণকারীদের জন্য তিনি ঠিক ততটাই কঠোর। যেসব সীমা পর্যন্ত তিনি ভুল-ত্রুটি ক্ষমা ও উপক্ষো করেন, যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি সে সীমাসমূহ লংঘন করে তখন তারা তাঁর শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। আর তাঁর শাস্তি এমন ভয়াবহ যে, কোন নির্বোধ মানুষই কেবল তা সহ্য করার মত বলে মনে করতে পারে।

পঞ্চম গুণ হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত দয়ালু অর্থাৎ দানশীল, অভাবশূন্য এবং উদার ও অকৃপণ। সমস্ত সৃষ্টিকূলের ওপর প্রতিমুহূর্তে তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি ব্যাপকভাবে বর্ষিত হচ্ছে। বান্দা যা কিছু লাভ করছে তা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেই লাভ করছে।

এ পাঁচটি গুণ বর্ণনা করার পর অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে দু'টি সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, মানুষ আর যত মিথ্যা উপাস্যই বানিয়ে রাখুক না কেন প্রকৃত উপাস্য একমাত্র তিনি। অপরটি হচ্ছে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। মানুষের কৃতকর্মসমূহের হিসেব গ্রহণকারী এবং সে অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী আর কোন উপাস্য নেই। অতএব, কেউ যদি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাস্য বানিয়ে নেয় তাহলে তার এ নির্বুদ্ধিতার ফল সে নিজেই ভোগ করবে।

২. বিতর্ক সৃষ্টি করার অর্থ বাক চাতুরী করা, ত্রুটি বের করা, আবোল-তাবোল আপত্তি উত্থাপন করা, পুর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন একটা শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে তা থেকে নানা রকম বিষয় বের করে তার ওপর সন্দেহ-সংশয় ও অপবাদের ইমারত নির্মাণ করা। বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে তার বিভ্রান্তিকর অর্থ করা যাতে ব্যক্তি নিজেও কথা বুঝতে না পারে এবং অন্যদেরকেও বুঝতে না দেয়। মতানৈক্য ও বিরোধ করার এ পন্থা কেবল তারাই গ্রহণ করে, যাদের মতানৈক্য ও মতবিরোধ অসদোদ্দেশ্য প্রণোদিত। সৎ নিয়তে বিরোধকারী বিতর্কে লিপ্ত হলেও বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই এবং প্রকৃত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে বিষয়টি সম্পর্কে তার নিজের দৃষ্টিকোণ সঠিক না বিপক্ষের দৃষ্টিকোণ সঠিক তা নিশ্চিত করতে চায়। এ ধরনের বিতর্ক হয় সত্যকে জানার জন্য, কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য নয়। পক্ষান্তরে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিপক্ষের লক্ষ তা বুঝা বা বুঝানো নয় বরং সে বিপক্ষকে পরাস্ত ও উত্যক্ত করতে চায়। অপরের কথা কোনভাবেই চলতে দেয়া যাবে না সে এ উদ্দেশ্যেই বিতর্কে লিপ্ত হয়। এ কারণে সে কখনো মূল প্রশ্নের মুখোমুখি হয় না, বরং সবসময় একথা সে কথা বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়।

৩. এখানে "কুফর" শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, নিয়ামতের অস্বীকৃতি অর্থে, দুই, ন্যায় ও সত্যের অস্বীকৃতি অর্থে। প্রথম অর্থ অনুসারে এ বাক্যাংশের মানে হচ্ছে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অর্থাৎ বাণী বা আদেশ-নিষেধসমূহের বিরুদ্ধে এ কর্মপন্থা কেবল সেসব লোকেরাই গ্রহণ করে যারা তাঁর অনুগ্রহরাজি ভুলে গিয়েছে এবং এ অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে যে, তাঁরই নিয়ামতের সাহায্যে তারা পালিত হচ্ছে। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এ বাক্যাংশের মানে হচ্ছে, যারা ন্যায় ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং না মানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেবল তারাই এ কর্মপন্থা গ্রহণ করে থাকে। পূর্বাপর বিষয় বিবেচনা করলে এ বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ক্ষেত্রে কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি বলতে যারা মুসলমান নয় এমন সব ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝানো হয়নি। কেননা, যেসব অমুসলিম ইসলামকে বুঝার উদ্দেশ্যে সৎ নিয়তে বিতর্ক করে এবং যে কথা বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে তা বুঝার জন্য ব্যাখ্যা পাওয়ার চেষ্টা করে, ইসলাম গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত পারিভাষিক অর্থে তারা কাফের বটে, কিন্তু সাথে সাথে একথাও সত্য যে, এ আয়াতে যে জিনিসটির নিন্দা করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍۭ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَٰدَلُوا بِالْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ النَّارِ ۝

এর পূর্বে নূহের (আ) কওম অস্বীকার করেছে এবং তাদের পরে আরো বহু দল ও গোষ্ঠী এ কাজ করেছে। প্রত্যেক উম্মত তার রসূলকে পাকড়াও করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা সবাই বাতিলের হাতিয়ারের সাহায্যে হককে অবদমিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। দেখে নাও, কত কঠিন ছিল আমার শাস্তি। অনুরূপ যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য তোমার রবের এ সিদ্ধান্তও অবধারিত হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে।[৫]

৪. আয়াতের প্রথমাংশ ও দ্বিতীয়াংশের মধ্যে একটা শূন্যতা আছে যা বুঝে নেয়ার দায়িত্ব শ্রোতাদের মন–মগজ ও চিন্তা–ভাবনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কথার ধরন থেকে আপনা আপনি এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, যারা আল্লাহর আয়াত বা আদেশ–নিষেধের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কর্মপন্থা গ্রহণ করে, তারা শাস্তি থেকে কখনো রক্ষা পেতে পারে না। তাদের দুর্ভাগ্যের পালা একদিন না একদিন অবশ্যই আসবে। এ মুহূর্তে যদিও তোমরা দেখছো যে, তারা এসব কিছু করেও আল্লাহর দুনিয়ায় নিশ্চিন্তে বুকটান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের জম–জমাট কারবার চলছে, জাঁক–জমকের সাথে তাদের কর্তৃত্ব ও শাসন চলছে এবং খুব ভোগ ও আরাম আয়েশের মধ্যে ডুবে আছে, তবুও এ ধোঁকায় পড়ো না যে, তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে গিয়েছে। কিংবা আল্লাহর আদেশ–নিষেধের বিরুদ্ধে লড়াই কোন খেল–তামাশার বিষয় যা তামাশা হিসেবে খেলা যেতে পারে এবং এ খেলার খেলোয়াড়দেরকে এর মন্দ ফলাফল কখনো ভোগ করতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে দেয়া অবকাশ। এ অবকাশকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে যারা যতটা অপকর্ম করে তাদের জাহাজ ততটা পূর্ণ হয়ে নিমজ্জিত হয়।

৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের ওপর যে আযাব এসেছে তা তাদের জন্য নির্ধারিত চূড়ান্ত আযাব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এ ফায়সালাও করে দিয়েছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, যেভাবে অতীত জাতিসমূহের দুর্ভাগ্য এসেছে, এখন যারা কুফরী করছে অনুরূপভাবে তাদের জন্যও আল্লাহর স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকেও জাহান্নামে যেতে হবে।

الَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٧

আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চার পাশে হাজির থাকে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং ঈমানদারদের জন্য দোয়া করে।[৬] তারা বলে : হে আমাদের রব, তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো।[৭] তাই মাফ করে দাও এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কারো[৮] যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে[৯] তাদেরকে।

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগীদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য একথা বলা হয়েছে। তারা সে সময় মক্কার কাফেরদের বিদ্রূপ, কটূভাষণ ও অত্যাচার এবং তাদের সামনে নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে দেখে ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়ছিলো। তাই বলা হয়েছে, এসব নীচু ও হীন লোকদের কথায় তোমরা মন খারাপ করছো কেন? তোমরা এমন মর্যাদার অধিকারী যে, আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতারা এবং আরশের চারপাশে অবস্থানরত ফেরেশতারা পর্যন্ত তোমাদের সহযোগী। তারা তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করছে। সাধারণ ফেরেশতাদের কথা না বলে আল্লাহর আরশের ধারক ও তার চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ ধারণা দেয়ার জন্য যে, মহান আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যের কর্মচারীরা তো বটেই, তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানরত যেসব ফেরেশতা ঐ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ এবং বিশ্ব-জাহানের শাসন কর্তার কাছে যারা নৈকট্য লাভ করেছে তারা পর্যন্ত তোমাদের প্রতি গভীর আগ্রহ ও সমবেদনা পোষণ করে। আরো বলা হয়েছে যে, এসব ফেরেশতা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ এবং ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। একথা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, ঈমানের বন্ধনই প্রকৃত বন্ধন যা আসমান ও যমীনবাসীদেরকে পরস্পর একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। এ সম্পর্কের কারণেই আরশের পাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের তাদের মতই আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান পোষণকারী মাটির মানুষদের সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ফেরেশতাদের ঈমান পোষণ করার অর্থ এই নয় যে, তারা কুফরী করতে পারতো। কিন্তু তা না করে তারা ঈমান গ্রহণ করেছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা এক ও লা-শরীক আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকেই স্বীকার করে নিয়েছে। এমন আর কোন সত্তা নেই যে তাদের আদেশ দান করে আর তারাও তার আনুগত্য করে চলে। ঈমান গ্রহণকারী মানুষ যখন এ পথই গ্রহণ করলো তখন এত বড় জাতিগত পার্থক্য ও স্থানগত দূরত্ব সত্ত্বেও তাদের এবং ফেরেশতাদের মধ্যে একই দৃষ্টিভঙ্গিগত দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

হে আমাদের রব উপরন্তু তাদেরকে তোমার প্রতিশ্রুত[১০] চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তাদের বাপ মা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল (তাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে পৌঁছিয়ে দাও)।[১১] তুমি নিসন্দেহে সর্বশক্তিমান ও মহাকৌশলী। আর তাদেরকে মন্দ কাজসমূহ থেকে রক্ষা করো।[১২] কিয়ামতের দিন তুমি যাকে মন্দ ও অকল্যাণসমূহ[১৩] থেকে রক্ষা করেছো তার প্রতি তুমি বড় করুণা করেছো। এটাই বড় সফলতা।

৭. অর্থাৎ তোমার বান্দার দুর্বলতা, বিচ্যুতি ও ভুল-ত্রুটি তোমার অজানা নয়। নিসন্দেহে তুমি সবকিছু জানো। কিন্তু তোমার জ্ঞানের মত তোমার রহমতও ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও এই অসহায়দের ক্ষমা করে দাও। আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তোমার জ্ঞানানুসারে যাদের সম্পর্কে তুমি জান যে, তারা সরল মনে 'তাওবা' করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে তোমার পথ অবলম্বন করেছে, দয়া ও রহমত দিয়ে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দাও।

৮. ক্ষমা করা ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করা যদিও পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এর একটি কথা বলার পর বাহ্যত অপর কথাটি বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। তবে এ বাচনভঙ্গি দ্বারা মূলত ঈমানদারদের প্রতি ফেরেশতাদের গভীর আগ্রহ প্রকাশ পায়। প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে, কোন ব্যাপারে কারো মন যদি আকৃষ্ট হয় সে যখন শাসকের কাছে আবেদন জানানোর সুযোগ লাভ করে তখন একই আবেদনকে সে বার বার নানাভাবে মিনতি করে পেশ করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে একটি কথা একবার মাত্র পেশ করে সে তৃপ্তি ও সান্ত্বনা পায় না।

৯. অর্থাৎ অবাধ্যতা পরিত্যাগ করেছে, বিদ্রোহ থেকে বিরত হয়েছে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে তোমার নিজের নির্দেশিত জীবন পথে চলতে শুরু করেছে।

১০. একথাটির মধ্যেও সেই মিনতি ভরা আবেদনের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান যার প্রতি আমরা ওপরে ৮নং টীকায় ইংগিত দিয়েছি। একথা সুস্পষ্ট যে, ক্ষমা করা এবং দোযখ থেকে রক্ষা করা দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করার অর্থও আপনা আপনিই এবং আনিবার্যভাবেই প্রকাশ পায়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা নিজে ঈমানদারদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

যারা কুফরী করেছে কিয়ামতের দিন তাদের ডেকে বলা হবে, "আজ তোমরা নিজেদের ওপর যতটা ক্রোধান্বিত হচ্ছো, আল্লাহ তোমাদের ওপর তার চেয়েও অধিক ক্রোধান্বিত হতেন তখন যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে আহবান জানানো হতো আর তোমরা উল্টা কুফরী করতে।"[১৪] তারা বলবে : হে আমাদের রব, প্রকৃতই তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছো এবং দু'বার জীবন দান করেছো।[১৫] এখন আমরা অপরাধ স্বীকার করছি।[১৬] এখন এখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় কি আছে?[১৭] (জবাব দেয়া হবে) এ অবস্থা যার মধ্যে তোমরা আছ, তা এ কারণে যে, যখন একমাত্র আল্লাহর দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা মানতে অস্বীকার করতে। কিন্তু যখন তাঁর সাথে অন্যদেরকেও শামিল করা হতো তখন মেনে নিতে। এখন তো ফায়সালা মহান ও মর্যাদাবান আল্লাহর হাতে।[১৮]

দিয়েছেন মু'মিনদেরকে সেটি দেয়ার জন্য দোয়া করা বাহ্যত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু ফেরেশতাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কল্যাণকামিতার এতটা আবেগ বিদ্যমান যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য একাধারে কল্যাণ কামনা করে দোয়া করে যাচ্ছে। অথচ তারা জানে, আল্লাহ তাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ অবশ্যই করবেন।

১১. অর্থাৎ তাদের চক্ষু শীতল করার জন্য তাদের মা-বাবা, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদেরও তাদের সাথে একত্রিত করে দেবেন। জান্নাতে ঈমানদারদেরকে যেসব নিয়ামত দান করা হবে তার বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা নিজেও একথা বলেছেন। দেখুন, সূরা রা'দ, আয়াত ২৩ এবং সূরা তূর, আয়াত ২১। সূরা তূরের আয়াতে এ কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় এবং তার মা, বাবা ও সন্তান-সন্ততি অনুরূপ মর্যাদা লাভ না করে তাহলে তাকে উচ্চ মর্যাদা থেকে নামিয়ে তাদের সাথে মিলিত করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার বাবা-মা ও সন্তান-সন্ততিকেই উচ্চ মর্যাদা দিয়ে তার পর্যায়ে উন্নীত করবেন।

১২. سَيِّئَات (মন্দ কাজসমূহ) তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। এক, ভুল আকীদা-বিশ্বাস, বিকৃত নৈতিক চরিত্র এবং মন্দ কাজ-কর্ম। দুই, গোমরাহী ও মন্দ কাজের পরিণাম। তিন, বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্ট—তা এ পৃথিবীর হোক, আলমে বারযাখ বা মৃত্যুর পরের জীবনের হোক কিংবা কিয়ামতের দিনের হোক। ফেরেশতাদের দোয়ার লক্ষ হলো, যেসব জিনিস তাদের জন্য অকল্যাণকর সেরূপ প্রতিটি জিনিস থেকে তাদের রক্ষা করো।

১৩. কিয়ামতের দিনের অকল্যাণ অর্থ হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা, ছায়া ও অন্যান্য আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া, হিসেব-নিকেশের কঠোরতা, সমস্ত সৃষ্টির সামনে জীবনের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ হয়ে যাওয়ার লাঞ্ছনা ও অপমান এবং সেখানে অপরাধীরা আর যেসব লাঞ্ছনা ও কষ্টের সম্মুখীন হবে তাও।

১৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফেররা যখন দেখবে যে, তারা পৃথিবীতে শিরক, নাস্তিকতা, আখেরাত অস্বীকৃতি এবং নবী-রসূলদের বিরোধিতার ওপর নিজেদের গোটা জীবনের তৎপরতার ভিত্তি স্থাপন করে যারপর নাই নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছে এবং সে নির্বুদ্ধিতার কারণে এখন চরম অকল্যাণকর ও অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তখন তারা নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে এবং বিরক্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদেরই অভিশাপ দিতে থাকবে। তখন ফেরেশতারা তাদের ডেকে বলবে, আজ তোমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হচ্ছো। কিন্তু ইতিপূর্বে পৃথিবীতে তোমাদেরকে এ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এবং সৎকর্মশীল লোকেরা সঠিক পথের দিকে আহবান জানাতেন আর তোমরা সে আহবান প্রত্যাখ্যান করতে তখন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ এর চেয়েও বেশী করে প্রজ্জ্বলিত হতো।

১৫. দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন বলতে সূরা বাকারার ২৮ আয়াতে যা বলা হয়েছে তাই বুঝানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহর সাথে কি করে কুফরী করো, অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনি তোমাদের প্রাণ দান করেছেন। এরপর তিনি পুনরায় তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং পরে আবার জীবন দান করবেন। কাফেররা এসব ঘটনার প্রথম তিনটি অস্বীকার করে না। কারণ, ঐগুলো বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সে জন্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তারা শেষোক্ত ঘটনাটির সংঘটন অস্বীকার করে। কারণ, এখনো পর্যন্ত তারা তা প্রত্যক্ষ করেনি এবং শুধু নবী-রসূলগণই এটির খবর দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন এ চতুর্থ অবস্থাটিও তারা কার্যত দেখতে পাবে এবং তখন স্বীকার করবে যে, আমাদেরকে যে বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছিলো তা প্রকৃতই সত্যে পরিণত হলো।

১৬. অর্থাৎ এ দ্বিতীয় জীবনটির কথা অস্বীকার করে আমরা যে ভুল করেছি এবং এ ভ্রান্ত মতবাদ অনুসারে কাজ করে আমাদের জীবন যে পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে তা আমরা স্বীকার করি।

১৭. অর্থাৎ এখন আমরা আযাবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি আমাদের পক্ষ থেকে অপরাধের স্বীকৃতিকে গ্রহণ করে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা কি আছে?

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۭ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿۱۳﴾ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰي مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿۱۵﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَي اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۭ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۭ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۱۶﴾

তিনিই তো তোমাদের নিদর্শনসমূহ দেখান[১৯] এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক নাযিল করেন[২০] (কিন্তু এসব নিদর্শন দেখে) কেবল তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী[২১] (সুতরাং হে প্রত্যাবর্তনকারীরা,) দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে[২২] তাঁকেই ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।

তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী,[২৩], আরশের অধিপতি।[২৪] তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে 'রূহ' নাযিল করেন[২৫] যাতে সে সাক্ষাতের দিন[২৬] সম্পর্কে সাবধান করে দেয়। সেটি এমন দিন যখন সব মানুষের সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। আল্লাহর কাছে তাদের কোন কথাই গোপন থাকবে না। (সেদিন ঘোষণা দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে) আজ রাজত্ব কার?[২৭] (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে) একমাত্র আল্লাহর যিনি কাহ্হার।

১৮. অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নিতে তোমরা রাজি ছিলে না সেই একমাত্র আল্লাহর হাতেই এখন ফায়সালা। আর ইলাহী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে যাদেরকে অংশীদার বানাতে তোমরা জিদ ধরেছিলে, ফায়সালার ক্ষেত্রে এখন তাদের কোন হাত নেই। (একথাটা বুঝার জন্য সূরা যুমারের ৪৫ আয়াত এবং তার ৬৪নং টীকার প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে) এ আয়াতাংশের মধ্যে আপনা থেকে এ অর্থও অন্তরভুক্ত হয়ে আছে যে, এখন আযাবের এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথও নেই। কারণ, তোমরা শুধু আখেরাত অস্বীকার করেছিলে তাই নয়, বরং তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহর প্রতিও ছিল তোমাদের চরম বিদ্রূপভাব। তাছাড়া তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করা ছাড়া তোমরা আদৌ কোন মানসিক তৃপ্তি লাভ করতে পারতে না।

১৯. নিদর্শনসমূহ বলতে সেসব নিদর্শনকে বুঝানো হয়েছে যা থেকে এ বিশ্ব–জাহানের নির্মাতা, কারিগর, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তা জানা যায়।

২০. এখানে রিযিক অর্থ বৃষ্টিপাত। কেননা, মানুষ এ পৃথিবীতে যত প্রকার রিযিক লাভ করে থাকে তা সবই বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এ একটি মাত্র নিদর্শনের কথা তুলে ধরে এ মর্মে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তোমরা যদি কেবল এ একটি জিনিসের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো তাহলে বুঝতে পারবে, কুরআনে তোমাদেরকে বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানের যে ধারণা দেয়া হচ্ছে সেটিই বাস্তব ও সত্য। পৃথিবী ও তার সমস্ত সৃষ্টিকুল এবং পানি, বাতাস, সূর্য, উষ্ণতা ও শীতলতা সবকিছুর স্রষ্টা যদি একমাত্র আল্লাহ হন কেবল সে ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধান সম্ভব। আর সে অনাদি অনন্ত আল্লাহই যদি চালু রাখেন কেবল তখনই এ ব্যবস্থা লক্ষ কোটি বছর পর্যন্ত একাধারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকারী কেবল একমাত্র আল্লাহই হতে পারেন যিনি মহাজ্ঞানী, অতি দয়াবান ও পালনকর্তা। যিনি পৃথিবীতে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদরাজি সৃষ্টি করার সাথে সাথে তাদের প্রয়োজন অনুসারে পানিও সৃষ্টি করেছেন এবং তা নিয়মিতভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌছিয়ে দেয়া ও ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিস্ময়কর এ ব্যবস্থাপনাও দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এসব দেখে শুনেও আল্লাহকে অস্বীকার করে কিংবা আরো কিছু সত্তাকে তাঁর প্রভুত্বে অংশীদার বানায় তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

২১. অর্থাৎ আল্লাহ বিমুখ ব্যক্তি যার জ্ঞান বুদ্ধির ওপর গাফলতি এবং গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার পর্দা পড়ে আছে সে কোন জিনিস দেখেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। তার পশু–চক্ষু এ দৃশ্য অবশ্যই দেখবে যে, বাতাস বয়ে গেল, মেঘরাশি উড়ে আসলো, বিদ্যুৎ চমকালো ও বজ্র ধ্বনি হলো এবং বৃষ্টিপাত হলো কিন্তু তার মানবিক মন–মগজ ভেবে দেখবে না, এসব কেন হচ্ছে, কে করছে এবং আমার কাছে তার কি কি অধিকার ও প্রাপ্য রয়েছে।

২২. দীনকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা যুমারের ৩নং টীকায় করা হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি থেকে তার মর্যাদা অনেক উচ্চে। এ বিশ্ব–জাহানে বিদ্যমান কোন সত্তাই সে ফেরেশতা, নবী, অলী বা অন্য কোন সৃষ্টি যাই হোক না কেন আর তার মর্যাদা অন্য সব সৃষ্টিকুলের তুলনায় যত উচ্চ ও উন্নতই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তাঁর শরীক হওয়ার ধারণা করা তো দূরের কথা তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার ধারে কাছে পৌঁছার কথাও কল্পনা করা যায় না।

২৪. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব–জাহানের বাদশাহ ও শাসক এবং এ সাম্রাজ্যের সিংহাসনের অধিপতি। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪১; ইউনুস, টীকা ৪; আর রা'দ, টীকা ৩; ত্বা–হা, টীকা ২)।

২৫. রূহ অর্থ অহী ও নবুওয়াত। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, আন–নাহল, টীকা ২; বনী ইসরাঈল, টীকা ১০৩।) আর "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা এ রূহ নাযিল

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝١٧ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۝١٨ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ۝١٩ وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝٢٠

(বলা হবে,) আজ প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি কোন জুলুম হবে না।[২৮] আল্লাহ অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।[২৯] হে নবী, এসব লোকদের সেদিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও যা সন্নিকটবর্তী হয়েছে।[৩০] যেদিন কলিজা মুখের মধ্যে এসে যাবে আর সব মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। জালেমদের জন্য না থাকবে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু,[৩১] না থাকবে কোন গ্রহণযোগ্য শাফায়াতকারী।[৩২] আল্লাহ চোখের চুরি ও মনের গোপন কথা পর্যন্ত জানেন। আল্লাহ সঠিক ও ন্যায় ভিত্তিক ফায়সালা করবেন। আর (এ মুশরিকরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে। তারা কোন কিছুরই ফায়সালাকারী নয়। নিসন্দেহে আল্লাহই সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[৩৩]

করেন।" এ বাণীর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ওপর কারো কোন ইজারাদারী নেই। অমুক ব্যক্তিকে সৌন্দর্য দান করা হয়েছে কেন এবং অমুক ব্যক্তিকে স্মরণ শক্তি বা অসাধারণ মেধা শক্তি দান করা হয়েছে কেন, একথা বলার অধিকার যেমন কেউ রাখে না, তেমনি কেউ একথা বলারও অধিকার রাখে না যে, অমুক ব্যক্তিকে নবুওয়াতের পদমর্যাদার জন্য বাছাই করা হয়েছে কেন এবং আমরা যাকে চাই তাকে নবী বানানো হয়নি কেন?

২৬. অর্থাৎ যেদিন সমস্ত মানুষ, জিন ও শয়তান একই সময়ে তাদের রবের সামনে উপস্থিত হবে এবং তাদের কাজ-কর্মের সমস্ত সাক্ষীও উপস্থিত হবে।

২৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে তো বহু অহংকারী ভ্রান্ত লোক নিজেদের বাদশাহী ও শক্তিমত্তার ডঙ্কা বাজাতো আর বহু সংখ্যক নির্বোধ তাদের বাদশাহী ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতো। এখন বলো প্রকৃতপক্ষে বাদশাহী কার? ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক কে? আর হুকুমই বা চলে কার? এটা এমন একটা বিষয় যে কোন ব্যক্তি যদি তা বুঝার চেষ্টা করে তাহলে সে

যত বড় বাদশাহ কিংবা একনায়ক হয়ে থাকুক না কেন, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার মন–মগজ থেকে শক্তিমত্তার সমস্ত অহংকার উবে যাবে। এখানে ঐতিহাসিক এ ঘটনাটা উল্লেখ্য যে, সামানী খান্দানের শাসক নাসর ইবনে আহমাদ (৩০১–৩৩১ হিঃ) নিশাপুরে প্রবেশ করলে একটি দরবার ডাকেন এবং সিংহাসনে বসার পর কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে কাজকর্ম শুরু হবে বলে আদেশ দেন। একথা শুনে একজন সম্মানিত জ্ঞানী ব্যক্তি অগ্রসর হন এবং এ রুকূ'টি তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন তখন নাসর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসন থেকে নামলেন এবং মাথার মুকুট খুলে সিজদায় পড়ে বললেন ঃ হে আমার প্রভু, বাদশাহী তোমারই, আমার নয়।

২৮. অর্থাৎ কোন ধরনের জুলুমই হবে না। প্রকাশ থাকে যে, প্রতিদানের ক্ষেত্রে জুলুমের কয়েকটি রূপ হতে পারে। এক, প্রতিদানের অধিকারী ব্যক্তিকে প্রতিদান না দেয়া। দুই, সে যতটা প্রতিদান লাভের উপযুক্ত তার চেয়ে কম দেয়া। তিন, শাস্তি যোগ্য না হলেও শাস্তি দেয়া। চার, যে শাস্তির উপযুক্ত তাকে শাস্তি না দেয়া। পাঁচ, যে কম শাস্তির উপযুক্ত তাকে বেশী শাস্তি দেয়া। ছয়, জালেমের নির্দোষ মুক্তি পাওয়া এবং মজলুমের তা চেয়ে দেখতে থাকা। সাত, একজনের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর আদালতে এ ধরনের কোন জুলুমই হতে পারবে না।

২৯. এর অর্থ হিসেব নিতে আল্লাহর কোন বিলম্ব হবে না। যেভাবে তিনি গোটা বিশ্ব–জাহানের সমস্ত সৃষ্টিকে যুগপৎ রিযিক দান করছেন এবং কাউকে রিযিক পৌছানোর ব্যবস্থাপনায় এমন ব্যস্ত নন যে, অন্যদের রিযিক দেয়ার অবকাশই তিনি পান না। যেভাবে তিনি গোটা বিশ্ব–জাহানের প্রতিটি জিনিসকে যুগপৎ দেখছেন, সমস্ত শব্দ যুগপৎ শুনছেন, প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ব্যাপারের ব্যবস্থাপনাও তিনি যুগপৎ করছেন এবং কোন জিনিস এমনভাবে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না যে, ঠিক সে মুহূর্তে তিনি আর সব বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন না, তেমনি তিনি যুগপৎ প্রত্যেক ব্যক্তির হিসেবেও গ্রহণ করবেন এবং একটি বিচার্য বিষয়ের শুনানিতে তিনি কখনো এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না যে, সে সময়ে অন্য অসংখ্য মোকদ্দমার শুনানি করতে পারবেন না। তাছাড়া তাঁর আদালতে এ কারণেও কোন বিলম্ব হবে না যে, মোকদ্দমার পটভূমি ও ঘটনাবলীর বিচার–বিশ্লেষণ এবং তার সাক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ কঠিন হবে। আদালতের বিচারক নিজে সরাসরি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবেন। মোকদ্দমার বাদী–বিবাদী উভয় পক্ষের সবকিছুই তাঁর জানা থাকবে। সমস্ত ঘটনার খুঁটি–নাটি সব দিক পর্যন্ত অনস্বীকার্য সাক্ষ প্রমাণসহ অনতিবিলম্বে সবিস্তার পেশ করা হবে। তাই সমস্ত মোকদ্দমার ফায়সালা ঝটপট হয়ে যাবে।

৩০. কুরআন মজীদে মানুষকে বার বার এ উপলব্ধি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিয়ামত তাদের থেকে বেশী দূরে নয়, বরং তা অতি সন্নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে এবং যে কোন মুহূর্তে সংঘটিত হতে পারে। কোথাও বলা হয়েছে ঃ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ (আল নাহল ১)।কোথাও বলা হয়েছে اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (আল আম্বিয়া ১) কোথাও সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ (আল ক্বামার ১)। কোথাও বলা হয়েছেঃ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

এসব লোক কি কখনো পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি তাহলে ইতিপূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের পরিণাম দেখতে পেতো? তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল এবং এদের চেয়েও বেশী শক্তিশালী স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীর বুকে রেখে গিয়েছে। কিন্তু গোনাহর কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষাকারী কাউকে পাওয়া যায়নি। তাদের এহেন পরিণতির কারণ হলো তাদের কাছে তাদের রসূল স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ[৩৪] নিয়ে এসেছিলো আর তারা তা মানতে অস্বীকার করেছিলো। অবশেষে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। নিসন্দেহে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কঠোর শাস্তিদাতা।

আমি মূসাকে[৩৫] ফেরাউন, হামান[৩৬] ও কারূণের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এবং আমার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ[৩৭] সহ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা বললো : জাদুকর, মিথ্যাবাদী।

دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (আন নাজ্‌ম ৫৭)। এসব কথার উদ্দেশ্য মানুষকে এ মর্মে সাবধান করে দেয়া যে, তারা যেন কিয়ামতকে দূরের কোন জিনিস মনে করে শঙ্কাহীন না থাকে। সতর্ক ও সামলিয়ে চলার প্রয়োজন মনে করলে এক মুহূর্তও নষ্ট না করে যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩১. মূল আয়াতে حَمِيمٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এমন বন্ধু যাকে প্রহৃত হতে দেখে নিজেও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে রক্ষার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়।

৩২. কাফেরদের শাফায়াত সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে অবরোহমূলক-ভাবে একথাটি বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জালেমদের জন্য সেখানে আদৌ কোন শাফায়াতকারী থাকবে না। কারণ, শাফায়াতের অনুমতি লাভ করলে কেবল আল্লাহর নেক বান্দারাই করবে। আর আল্লাহর নেক বান্দারা কখনো কাফের, মুশরিক এবং ফাসেক ও পাপাচারীদের বন্ধু হতে পারে না যে, তারা-তাদের বাঁচানোর জন্য শাফায়াত করার চিন্তা করবে। তবে যেহেতু কাফের, মুশরিক ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাধারণ আকীদা–বিশ্বাস অতীতেও এই ছিল এবং বর্তমানেও আছে যে, আমরা যে বুযর্গদের অনুসরণ করে চলেছি তারা কখনো আমাদেরকে দোযখে যেতে দেবেন না। তারা বরং বাধা হয়ে সামনে দাঁড়াবেন এবং ক্ষমা করিয়েই ছাড়বেন। তাই বলা হয়েছে সেখানে এ রকম শাফায়াতকারী কেউ থাকবে না, যার কথা মেনে নেয়া হবে এবং আল্লাহকে যার সুপারিশ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

৩৩. অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপাস্যদের মত কোন অন্ধ ও বধির আল্লাহ নন যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন তার কৃতকর্ম সম্পর্কে কিছু জানেন না।

৩৪. স্পষ্ট নিদর্শন বলতে তিনটি জিনিস বুঝানো হয়েছে। এক, এমন সুস্পষ্ট চিহ্ন ও নিদর্শন যা তাঁদের আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ার প্রমাণ। দুই, এমন সব উজ্জ্বল প্রমাণ যা তাঁদের আনীত শিক্ষার সত্যতা প্রমাণ করছিলো। তিন, জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে এমন সব সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা যা দেখে যে কোন যুক্তিবাদী মানুষ বুঝতে পারতো যে, কোন স্বার্থপর মানুষ এরূপ পবিত্র শিক্ষা দিতে পারে না।

৩৫. হযরত মূসার (আ) কাহিনীর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ৬৪ থেকে ৭৬; আন নিসা, টীকা ২০৬; আল মা–য়েদা, টীকা ৪২; আল আ'রাফ, টীকা ৯৩ থেকে ১১৯; ইউনুস, টীকা ৭২ থেকে ৯৪; হূদ, টীকা ১৯, ১০৪, ১১১; ইউসুফ, ভূমিকা; ইবরাহীম, টীকা ৮ থেকে ১৩; বনী ইসরাঈল, টীকা ১১৩ থেকে ১১৭; আল কাহাফ, টীকা ৫৭ থেকে ৫৯; মারয়াম, টীকা ২৯ থেকে ৩১, ত্বাহা, ভূমিকা, টীকা ৫ থেকে ৭৫; আল মু'মিনূন, টীকা ৩৯–৪২; আশ শু'আরা, টীকা ৭ থেকে ৪৯; আন নামল, টীকা ৮ থেকে ১৭১; আল কাসাস, ভূমিকা, টীকা ১ থেকে ৫৭; আল আহযাব আয়াত ৬৯; আস সাফ্‌ফাত, আয়াত ১১৪ থেকে ১২২।

৩৬. হামান সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বীদের আপত্তির জবাব ইতিপূর্বে সূরা কাসাসের টীকাসমূহে দেয়া হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ এমন স্পষ্ট নিদর্শনসহ যা দেখে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতো না যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আর তাঁর পক্ষে আছে বিশ্ব–জাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর শক্তি। যে নিদর্শনগুলোকে এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মূসার (আ) আদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেগুলো কি কুরআন মজীদে হযরত মূসার (আ) কাহিনীর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সে দিকে গভীরভাবে লক্ষ করলে তা বুঝা যায়। প্রথমত এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে কয়েক বছর আগে যে ব্যক্তি ফেরাউনের কওমের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো এবং যার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল, সে একখানা লাঠি হাতে হঠাৎ

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

অতপর যখন সে আমার পক্ষ থেকে সত্য এনে হাজির করলো[৩৮] তখন তারা বললো, যারা ঈমান এনে তার সাথে সামিল হয়েছে তাদের ছেলেদের হত্যা করো এবং মেয়েদের জীবিত রাখো।[৩৯] কিন্তু কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়ে গেল।[৪০]

একদিন[৪১] ফেরাউন তার সভাসদদের বললো ঃ আমাকে ছাড়ো, আমি এ মূসাকে হত্যা করবো।[৪২] সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দীনকে পাল্টে দেবে কিংবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।[৪৩]

মূসা বললো, যেসব অহংকারী হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না, তাদের প্রত্যেকের মোকাবিলায় আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।[৪৪]

সোজা ফেরাউনের ভরা দরবারে নির্ভীক ও নিশঙ্কচিত্তে হাজির হচ্ছে এবং সাহসিকতার সাথে বাদশাহ ও তার সভাসদদের সম্বোধন করে আহবান জানাচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেয় এবং তার নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে। কিন্তু তার গায়ে হাত তোলার সাহস কারো হচ্ছে না। অথচ মূসা (আ) যে কওমের লোক তারা এমন নিদারুনভাবে গোলামীর যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিলো যে, হত্যার অভিযোগে যদি তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করা হতো তাহলে তার কওমের বিদ্রোহ করা তো দূরের কথা প্রতিবাদের জন্য মুখ খোলারও কোন আশংকা ছিল না। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, লাঠি ও "ইয়াদে বায়দা"র (শ্বেত–শুভ্র হাত) মু'জিযা দেখারও পূর্বে ফেরাউন এবং তার সভাসদরা হযরত মূসার (আ) আগমনেই ভীত হয়ে পড়েছিলো। প্রথম দর্শনেই তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, এ ব্যক্তি অন্য কোন শক্তির ভরসায় এখানে এসেছে। অতপর তার হাতে একের পর এক বিস্ময়কর যেসব মু'জিযা সংঘটিত হলো তার প্রত্যেকটি এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, এটা জাদুশক্তি নয়, বরং খোদায়ী

শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশ। এমন কোন জাদু আছে যার জোরে লাঠি সত্যিকার আজদাহায় রূপান্তরিত হতে পারে? কিংবা গোটা একটা দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হতে পারে? কিংবা একটি নোটিশ দেয়ার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটি এলাকায় নানা ধরনের ঝড় তুফান আসতে পারে এবং আরেকটি নোটিশে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে? কুরআন মজীদের বর্ণনা অনুসারে এ কারণে ফেরাউন ও তার দায়িত্বশীল লোকজন মুখে যত অস্বীকার করুক না কেন, মন তাদের পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, হযরত মূসা (আ) সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৮৬ থেকে ৮৯; ত্বা–হা, টীকা ২৯ থেকে ৫৩; আশ শু'আরা, টীকা ২২ থেকে ৪১; আন নামল, টীকা ১৬)।

৩৮. অর্থাৎ যখন হযরত মূসা (আ) একের পর এক মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে পুরোপুরি প্রমাণ করলেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং মজবুত প্রমাণাদি দ্বারা তাঁর সত্য হওয়া সুস্পষ্ট করে দিলেন।

৩৯. পূর্বেই সূরা আ'রাফের ১২৭ আয়াতে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, ফেরাউনের দরবারের লোকজন তাকে বলেছিলো, মূসাকে এভাবে অবাধে তৎপরতা চালানোর অধিকার আর কতদিন দেয়া যাবে এবং তার জবাবে ফেরাউন বলেছিলো অচিরেই আমি বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখার নির্দেশ দিতে যাচ্ছি। (তাফহীমুল কুরআন , আল আ'রাফ, টীকা ৯৩)। এ আয়াতটি থেকে জানা যাচ্ছে যে, ফেরাউনের পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত যে নির্দেশ জারী করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর সহযোগী ও অনুসারীদের এতটা ভীত সন্ত্রস্ত করে দেয়া যে, তারা যেন ভয়ের চোটে তার পক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৪০. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلاَلٍ । এ আয়াতাংশের আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, ঐ কাফেরদের চক্রান্ত ছিল গোমরাহী, জুলুম–নির্যাতন এবং ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতার খাতিরে। অর্থাৎ ন্যায় ও সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং মনে মনে তার সমর্থক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জিদ ও হঠকারিতা বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং সত্যকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য তারা জঘন্য থেকে জঘন্যতম পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধান্বিত হয়নি।

৪১. এখান থেকে যে ঘটনার বর্ণনা শুরু হচ্ছে তা বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অথচ বনী ইসরাঈল নিজেরাই তা বিস্মৃত হয়ে বসেছে। বাইবেল এবং তালমুদে এর কোন উল্লেখ নেই এবং অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনায়ও তার কোন নাম গন্ধ পর্যন্ত দেখা যায় না। ফেরাউন এবং হযরত মূসার (আ) মধ্যকার সংঘাতের যুগে এক সময় এ ঘটনাটিও যে সংঘটিত হয়েছিলো বিশ্ববাসী কেবল কুরআন মজীদের মাধ্যমেই তা জানতে পেরেছে। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে শত্রুতায় অন্ধ হয়ে না থাকলে যে ব্যক্তিই এ কাহিনী পাঠ করবে সে একথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে, ন্যায় ও সত্যের দিকে আহবানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাহিনী অত্যন্ত মূল্যবান ও বিশেষ মর্যাদার দাবীদার। তাছাড়া হযরত মূসার (আ) ব্যক্তিত্ব, তাঁর তাবলীগ ও প্রচার এবং তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া বিস্ময়কর মু'জিযাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফেরাউনের নিজের সভাসদদের মধ্য থেকে কারো সংগোপনে ঈমান গ্রহণ করা এবং মূসাকে (আ) হত্যার

ব্যাপারে ফেরাউনকে উদ্যোগী হতে দেখে আত্মসংবরণ করতে না পারা বুদ্ধি-বিবেক ও যুক্তি বিরোধীও নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার লম্বা চওড়া দাবি সত্ত্বেও গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতায় অন্ধ হয়ে কুরআনের সুস্পষ্ট সত্যসমূহের ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টা চালায়। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের "মূসা" নামক প্রবন্ধের লেখক এ শিরোনামের প্রবন্ধে যা লিখেছেন তা থেকেই একথা বুঝা যায়। তিনি লিখছেন :

"ফেরাউনের দরবারে একজন বিশ্বাসী মূসাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, কুরআনের বর্ণিত এ কাহিনী সুস্পষ্ট নয় (সূরা ৪০, আয়াত ২৮)। আমরা কি তাহলে হাগ্‌গাদায় বর্ণিত কাহিনীর বিষয়বস্তুর সাথে এ কাহিনীর তুলনা করবো যাতে ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিতে কাজ করার জন্য ইয়েথরো ফেরাউনের দরবারে পরামর্শ দিয়েছিলো?"

জ্ঞান গবেষণার এসব দাবিদারদের কাছে এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ যে, কুরআনের প্রতিটি বিষয়ে অবশ্যই খুঁত বের করতে হবে। কুরআনের কোন বক্তব্যের মধ্যে যদি কোন খুঁত বের করার সুযোগ না-ই পাওয়া যায় তাহলেও অন্তত এতটুকু যেন বলা যায় যে, এ কাহিনী পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। এভাবে ধীরে ধীরে পাঠকদের মনে এ সন্দেহও সৃষ্টি করে দেয়ার চেষ্টা করা যে, ইয়েথরো কর্তৃক মূসার (আ) জন্য পূর্ব যে কাহিনী হাগ্‌গাদায় বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো কোথাও থেকে তা শুনে থাকবেন এবং সেটাই এখানে এভাবে বর্ণনা করে থাকবেন। এটা হচ্ছে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার একটা বিশেষ স্টাইল যা এসব লোকেরা ইসলাম, কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে অবলম্বন করে চলেছে।

৪২. একথার দ্বারা ফেরাউন এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে যেন কিছু লোক তাকে বিরত রেখেছে আর সেই কারণে সে মূসাকে (আ) হত্যা করছে না। তারা যদি বাধা না দিতো তাহলে বহু পূর্বেই সে তাঁকে হত্যা করে ফেলতো। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাইরের কোন শক্তিই তাকে বাধা দিচ্ছিলো না। তার মনের ভীতিই তাকে আল্লাহর রসূলের গায়ে হাত তোলা থেকে বিরত রেখেছিলো।

৪৩. অর্থাৎ আমি তার পক্ষ থেকে বিপ্লবের আশংকা করছি। আর সে যদি বিপ্লব করতে নাও পারে তাহলে এতটুকু বিপদাশঙ্কা অন্তত অবশ্যই আছে যে, তার কর্ম-তৎপরতার ফলে দেশে অবশ্যই বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই সে মৃত্যুদণ্ড লাভের মত কোন অপরাধ না করলেও শুধু দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার (Maintenance of public order) খাতিরে তাকে হত্যা করা প্রয়োজন। সে ব্যক্তির ব্যক্তি সত্তা আইন শৃঙ্খলার জন্য সত্যিই বিপজ্জনক কিনা তা দেখার দরকার নেই। সে জন্য শুধু "হিজ ম্যাজেষ্টি"র সন্তুষ্টিই যথেষ্ট। মহামান্য সরকার যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, এ লোকটি বিপজ্জনক তাহলে মেনে নিতে হবে, সে সত্যিই বিপজ্জনক এবং সে জন্য শিরোচ্ছেদের উপযুক্ত।

এ স্থানে "দীন পাল্টে দেয়া"র অর্থও ভালভাবে বুঝে নিন, যার আশঙ্কায় ফেরাউন হযরত মূসাকে (আ) হত্যা করতে চাচ্ছিলো। এখানে দীন অর্থ শাসন ব্যবস্থা। তাই ফেরাউনের কথার অর্থ হলো انی اخاف ان یغیر سلطانکم (روح المعانی ج ٢٤ ص٥٦)। অন্য কথায়, ফেরাউন ও তার খান্দানের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে ধর্ম, রাজনীতি, সভ্যতা ও অর্থনীতির যে ব্যবস্থা মিসরে চলছিলো তা ছিল তৎকালে ঐ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

৪ রুকূ'

এ সময় ফেরাউনের দরবারের এক ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন রেখেছিলো— বললো ঃ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আল্লাহ আমার রব? অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে।[৪৫] সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তার মিথ্যার দায়–দায়িত্ব তারই[৪৬]। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে যেসব ভয়ানক পরিণামের কথা সে বলছে তার কিছুটা তো অবশ্যই তোমাদের ওপর আসবে। আল্লাহ কোন সীমালংঘনকারী মিথ্যাবাদী লোককে হিদায়াত দান করেন না।[৪৭]

দেশের 'দীন'। আর ফেরাউন হযরত মূসার আন্দোলনের কারণে এ দীন পাল্টে যাওয়ার আশংকা করছিলো। কিন্তু প্রত্যেক যুগের কুচক্রী ও ধূরন্ধর শাসকদের মত সেও একথা বলছে না যে, আমার হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার আশংকা করছি। তাই আমি মূসাকে হত্যা করতে চাই। বরং পরিস্থিতিকে সে এভাবে পেশ করছে যে, হে জনগণ, বিপদ আমার নয়, তোমাদের। কারণ মূসার আন্দোলন যদি সফল হয়, তাহলে তোমাদের দীন বদলে যাবে। নিজের জন্য আমার চিন্তা নেই। আমি তোমাদের চিন্তায় নিশেষ হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, আমার ক্ষমতার ছত্রছায়া থেকে বঞ্চিত হলে তোমাদের কি হবে। তাই যে জালেমের দ্বারা তোমাদের ওপর থেকে এ ছত্রছায়া উঠে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে তাকে হত্যা করা প্রয়োজন। কারণ সে দেশ ও জাতি উভয়ের শত্রু।

৪৪. এখানে দু'টি সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ দু'টি সম্ভাবনার কোনটিকেই অগ্রাধিকার দেয়ার কোন ইংগিত এখানে নেই। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে, হযরত মূসা নিজেই সে সময় দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং হযরত মূসা (আ) তাকে ও তার সভাসদদের উদ্দেশ করে তখনই সবার সামনে প্রকাশ্যে এ জবাব দেন। অপর সম্ভাবনাটি হচ্ছে, ফেরাউন হযরত মূসার (আ) অনুপস্থিতিতে তার সরকারের দায়িত্বশীল লোকদের কোন মজলিসে একথা প্রকাশ করে এবং হযরত মূসাকে (আ) তার এ আলোচনার খবর কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোক পৌঁছিয়ে দেয়, আর তা শুনে তিনি তাঁর অনুসারীদের একথা বলেন। এ দু'টি অবস্থার যেটিই বাস্তবে ঘটে থাকুক না কেন হযরত মূসার (আ) কথায় স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে যে,

ফেরাউনের হুমকি তাঁর মনে সামান্যতম ভীতিভাবও সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার হুমকির জবাব তার মুখের ওপরেই দিয়ে দিয়েছেন। যে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুরআন মজীদে এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে আপনা আপনি একথা প্রকাশ পায় যে, "হিসেবের দিন" সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যেসব জালেমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিলো তাদের জন্যও সে একই জবাব।

৪৫. অর্থাৎ সে তোমাদেরকে এমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়েছে যে, সে যে তোমাদের রবের রসূল তা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমানদার ব্যক্তির ইংগিত ছিল সে নিদর্শনসমূহের প্রতি যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। (তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১, এবং ৯৪ থেকে ৯৬; বনী ইসরাঈল, টীকা ১১৩ থেকে ১১৬; ত্বা–হা, টীকা ২৯ থেকে ৫০; আশ শু'আরা, টীকা ২৬ থেকে ৩৯; আন নামল, টীকা ১৬)।

৪৬. অর্থাৎ এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করো, সে ক্ষেত্রেও তোমাদের জন্য উচিত তাকে তার মত চলতে দেয়া। কারণ, অপর সম্ভাবনা এবং অত্যন্ত জোরদার সম্ভাবনা হচ্ছে, সে সত্যবাদী। আর সে ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করে আল্লাহর আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদীও মনে করো তবুও তাকে বাধা দিও না। সে যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে আল্লাহ নিজেই তার সাথে বুঝা পড়া করবেন। এর আগে হযরত মূসা আলাইহিস সালামও প্রায় অনুরূপ কথাই ফেরাউনকে বলেছিলেন ঃ

وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ (الدخان : ٢١)

"তোমরা যদি কথা না মানো তাহলে আমাকে আমার মত চলতে দাও।"

এখানে এ বিষয় লক্ষ রাখতে হবে যে, ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার মু'মিন ব্যক্তি তার বক্তব্যের শুরুতে স্পষ্ট করে একথা বলেনি যে, সে হযরত মূসার (আ) প্রতি ঈমান এনেছে। প্রথম দিকে সে এমনভাবে তার বক্তব্য পেশ করেছে যাতে মনে হয় সে ফেরাউনের গোষ্ঠীরই একজন লোক এবং তার জাতির কল্যাণের জন্যই সে এ কথা বলছে। কিন্তু যখন সে দেখছে ফেরাউন ও সভাসদরা কোনক্রমেই সঠিক পথ অনুসরণ করতে চাচ্ছে না তখন শেষ মুহূর্তে সে তার ঈমানের গোপনীয়তা প্রকাশ করছে। পঞ্চম রুকূ'তে তার বক্তব্য থেকে তা প্রকাশ পাচ্ছে।

৪৭. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ সম্ভব। ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তি হয়তো ইচ্ছা করেই এ দ্ব্যর্থবোধক শব্দটি এ জন্য বলেছিলো যে, তখনো সে তার ধ্যান–ধারণা খোলাখুলি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলো না। এর একটি তাৎপর্য হচ্ছে, একই ব্যক্তির মধ্যে সত্যবাদিতার মত গুণ এবং মিথ্যা ও অপবাদের মত দোষের সমাবেশ ঘটতে পারে না। তোমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছো, মূসা (আ) একজন অতীব পবিত্র চরিত্র এবং অত্যন্ত উন্নত স্বভাবের মানুষ। তোমাদের মন–মগজে একথা কি করে স্থান পায়

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۭ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝

হে আমার কওমের লোকেরা, আজ তোমরা বাদশাহীর অধিকারী এবং এ ভূ-ভাগের বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহর আযাব যদি আমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করার মত কে আছে?[৪৮]

ফেরাউন বললো, আমি যা ভাল মনে করছি সে মতামতই তোমাদের সামনে পেশ করছি। আর আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনাই দিচ্ছি।[৪৯]

যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো, বললো : হে আমার কওমের লোকেরা, আমার আশংকা হচ্ছে, তোমাদের ওপরও সেদিনের মত দিন এসে না যায়, যা এর আগে বহু দলের ওপর এসেছিলো। যেমন দিন এসেছিলো নূহ (আ), আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কওমসমূহের ওপর। আর এটা সত্য যে, আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর জুলুম করার কোন ইচ্ছা রাখেন না।[৫০]

যে, এক দিকে সে এত বড় মিথ্যাবাদী যে আল্লাহর নাম নিয়ে নবুওয়াতের ভিত্তিহীন দাবী করছে, অন্যদিকে তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে এরূপ উন্নত স্বভাব চরিত্র দান করেছেন। এর আরেকটি তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা যদি সীমালংঘনের মাধ্যমে মূসার (আ) প্রাণ নাশের জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তোমাদের দূরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে তৎপর হও তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ কখনো তোমাদেরকে সফল হতে দেবেন না।

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া এ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিরূপ নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে নিজেদের জন্য তাঁর গযব ডেকে আনছো কেন?

৪৯. ফেরাউনের এ জবাব থেকে বুঝা যায় তার দরবারের এ সভাসদ যে মনে মনে ঈমান এনেছে, তা সে তখনো পর্যন্ত জানতে পারেনি। এ কারণে সে তার কথায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি বটে তবে একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তার মতামত ও চিন্তা ভাবনা শোনার পরও সে নিজের মত পাল্টাতে প্রস্তুত নয়।

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ
مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾
وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا
جَآءَكُمْ بِهٖ ۗ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۗ
كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾

হে কওম, আমার ভয় হয়, তোমাদের ওপর ফরিয়াদ ও অনুশোচনা করার দিন না এসে পড়ে, যখন তোমরা একে অপরকে ডাকতে থাকবে এবং দৌড়িয়ে পালাতে থাকবে। কিন্তু সেখানে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। এর আগে ইউসুফ তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তোমরা তার আনীত শিক্ষার ব্যাপারে সন্দেহই পোষণ করেছো। পরে তার ইন্তিকাল হলে তোমরা বললে ঃ এখন আর আল্লাহ কোন রাসূল পাঠাবেন না।[৫১] এভাবে[৫২] আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদের গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ প্রবণ হয়।

৫০. অর্থাৎ বান্দার সাথে আল্লাহর কোন শত্রুতা নেই যে, তিনি অযথা তাদের ধ্বংস করবেন। তিনি তাদের ওপর আযাব কেবল তখনই পাঠান যখন তারা সীমালংঘন করে। আর সে সময় তাদের ওপর আযাব তাঁর ন্যায় ও ইনসাফের দাবী হয়ে দাঁড়ায়।

৫১. অর্থাৎ তোমাদের গোমরাহী এবং সে গোমরাহীর ব্যাপারে তোমাদের হঠকারিতার অবস্থা এই যে, মূসা আলাইহিস সালামের পূর্বে তোমাদের দেশে ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবী হয়ে এসেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তোমরা নিজেরাও স্বীকার করো যে, তিনি অত্যন্ত উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, একথাও তোমরা স্বীকার করো যে, সে সময়ে তোমাদের ওপর যে দুর্ভিক্ষ এসেছিলো তৎকালীন বাদশাহর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা বলে দিয়ে সাত বছর ব্যাপী সে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের ধ্বংসকারিতা থেকে তিনি তোমাদের রক্ষা করেছিলেন। তোমাদের গোটা জাতি একথাও স্বীকার করে যে, তাঁর শাসনামলের চেয়ে অধিক ন্যায় ও ইনসাফ এবং কল্যাণ ও বরকতের যুগ মিসরে আর কখনো আসেনি। কিন্তু তাঁর এসব গুণাবলী জানা ও মানা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ওপর কখনো ঈমান আনো নাই। তাঁর মৃত্যু হলে তোমরা বলতে শুরু করলে, তাঁর মত লোক কি আর কখনো জন্ম নিতে পারে? তোমরা তাঁর গুণাবলী স্বীকার করলেও পরবর্তী কালেও সেটিকেই যেন তোমরা পরবর্তী সমস্ত নবীকে অস্বীকার করার একটা

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ
اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ
الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي
لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন সনদ বা প্রমাণ আসেনি।[৫৩] আল্লাহ ও ঈমানদারদের কাছে এ আচরণ অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর মনে মোহর লাগিয়ে দেন।[৫৪]

ফেরাউন বললো ঃ "হে হামান, আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করো যাতে আমি রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি অর্থাৎ আসমানের রাস্তা এবং মূসার ইলাহকে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি। মূসাকে মিথ্যাবাদী বলেই আমার মনে হয়।"[৫৫] এভাবে ফেরাউনের জন্য তার কুকর্মসমূহ সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার সোজা পথে চলা থামিয়ে দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্ত (তার নিজের) ধ্বংসের পথেই ব্যয়িত হয়েছে।

স্থায়ী বাহানা বানিয়ে নিয়েছো। এর অর্থ, কোন অবস্থায়ই তোমরা হিদায়াত গ্রহণ করবে না।

৫২. বাহ্যত মনে হয়, ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তির বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও সংযোজনা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী বাক্যগুলো বলেছেন।

৫৩. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে সেসব লোককেই গোমরাহীতে নিক্ষেপ করা হয় যাদের মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট রয়েছে। এক, তারা কুকর্মে সীমা লংঘন করে এবং গোনাহ ও পাপাচারে এমনভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে যে, নৈতিক চরিত্র সংশোধনের কোন আহবানই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। দুই, নবী-রসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত থাকা হয় তাদের স্থায়ী আচরণ। আল্লাহর নবী তাদের সামনে যত সুস্পষ্ট নিদর্শনই পেশ করুন না কেন, তারা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۞ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

৫ রুকূ'

যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো, বললো ঃ হে আমার কওমের লোকেরা, আমার কথা মেনে নাও। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি। হে কওম, দুনিয়ার এ জীবন তো কয়েক দিনের জন্য।[৫৬] একমাত্র আখেরাতই চিরদিনের অবস্থানস্থল। যে মন্দ কাজ করবে সে যতটুকু মন্দ করবে ততটুকুরই প্রতিফল লাভ করবে। আর নারী হোক বা পুরুষ যে নেক কাজ করবে সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে তারা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে বে হিসেব রিযিক দেয়া হবে।

করে। তাছাড়া তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে তারা যেসব সত্য ও বাস্তবতা পেশ করেছেন তারা সেগুলোকেও সবসময় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। তিন, তারা আল্লাহর কিতাবের বাণীসমূহ সম্পর্কে যুক্তি গ্রাহ্য পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে কূট তর্কের দ্বারা তার মোকাবিলার চেষ্টা করে। তাদের এ কূট তর্কের ভিত্তি কোন জ্ঞানগত যুক্তি বা আসমানী কিতাবের সনদ নয় বরং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের জিদ ও হঠকারিতাই তার একমাত্র ভিত্তি। যখন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে এ তিনটি দোষ দেখা দেয় আল্লাহ তখন তাদেরকে গোমরাহীর গহবরে নিক্ষেপ করেন। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

৫৪. অর্থাৎ বিনা কারণে কারো মনে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয় না। যার মধ্যে অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি হয় লা'নতের এ মোহর কেবল তার মনের ওপরেই লাগানো হয়। 'তাকাববুর' অর্থ ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার যার কারণে ন্যায় ও সত্যের সামনে মাথা নত করাকে সে তার মর্যাদার চেয়ে নীচু কাজ বলে মনে করে। স্বেচ্ছাচারিতা অর্থ আল্লাহর সৃষ্টির ওপর জুলুম করা। এ জুলুমের অবাধ লাইসেন্স লাভের জন্য ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াতের বাধ্য-বাধকতা মেনে নেয়া থেকে দূরে থাকে।

৫৫. ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার মু'মিন ব্যক্তির বক্তব্য পেশের সময় ফেরাউন হামানকে সম্বোধন করে একথা কিছুটা এমন ভঙ্গিতে বলছে যেন সে ঐ মু'মিনের কথাকে

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۡ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۭ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

হে কওম, কি ব্যাপার যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহবান জানাচ্ছি আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে আহবান জানাচ্ছো। তোমরা আমাকে আহবান জানাচ্ছো যেন আমি আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং সেসব সত্তাকে তাঁর সাথে শরীক করি যাদের আমি জানি না।[৫৭] অথচ আমি তোমাদের সে মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে আহবান জানাচ্ছি। না, সত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা যেসব জিনিসের দিকে আমাকে ডাকছো, তাতে না আছে দুনিয়াতে কোন আবেদন না আছে আখেরাতে কোন আহবান।[৫৮] আমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর সীমালংঘনকারী[৫৯] আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। আজ তোমাদেরকে আমি যা বলছি অচিরেই এমন সময় আসবে যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক।[৬০]

আদৌ বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করে না। তাই অহংকারী ভঙ্গিতে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হামানকে বলছে? আমার জন্য একটা উঁচু ইমারত নির্মাণ করো। আমি দেখতে চাই, মূসা যে আল্লাহর কথা বলে সে আল্লাহ কোথায় থাকে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল কাসাস, টীকা ৫২ থেকে ৫৪)।

৫৬. অর্থাৎ তোমরা যে এ পৃথিবীর অস্থায়ী ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে গর্বিত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছো তা তোমাদের অজ্ঞতা।

৫৭. অর্থাৎ তারা আল্লাহর শরীক এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন জ্ঞানগত প্রমাণ নেই। তাই আমি চোখ বন্ধ করে এত বড় কথা কি করে মেনে নিতে পারি যে, প্রভুত্বে তাদেরও অংশীদারিত্ব আছে এবং আল্লাহর বন্দেগী করার সাথে সাথে আমাকে তাদের বন্দেগীও করতে হবে।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۟ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

শেষ পর্যন্ত তারা ঐ ঈমানদারের বিরুদ্ধে যেসব জঘন্য চক্রান্ত করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।[৬১] আর ফেরাউনের সাংগপাংগরাই জঘন্য আযাবের চক্রে পড়ে গিয়েছে।[৬২] দোযখের আগুন, যে আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল–সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।[৬৩] তারপর একটু চিন্তা করে দেখো সে সময়ের কথা যখন এসব লোক দোযখের মধ্যে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা সেসব লোকদের বলবে যারা নিজেদের বড় মনে করতো, "আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন এখানে কি তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের কষ্টের কিছু অংশ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে?"[৬৪]

৫৮. এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তাদের প্রভুত্ব মেনে নেয়ার জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকে দাওয়াত দেয়ার অধিকার তাদের দুনিয়াতেও নেই আখেরাতেও নেই। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মানুষ জোর করে তাদেরকে ইলাহ বানিয়েছে। অন্যথায় তারা নিজেরা না দুনিয়াতে প্রভুত্বের দাবী করে, না আখিরাতে এ দাবী করবে যে, আমরাও ইলাহ ছিলাম। তোমরা আমাদেরকে কেন মেনে নাওনি? তৃতীয় অর্থ তাদেরকে ডাকার কোন উপকার না এই দুনিয়ায় আছে, না আখেরাতে আছে। কেননা, তারা একেবারেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বহীন এবং তাদেরকে ডাকা একেবারেই অর্থহীন।

৫৯. 'সীমালংঘন করা' অর্থ ন্যায় ও সত্যকে লংঘন করা। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্ব মেনে নেয় অথবা নিজেই প্রভু হয়ে বসে কিংবা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পৃথিবীতে নিজে স্বাধীন হওয়ার নীতি ও আচরণ করে এবং নিজের ওপর, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির ওপর এবং পৃথিবীর যে জিনিসের সাথেই তারা সংশ্লিষ্ট হয় তার ওপরই অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে, এসব ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের সকল সীমালংঘনকারী মানুষ।

৬০. এ আয়াতাংশ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, একথা বলার সময় উক্ত মু'মিন ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ সত্য বলার অপরাধে সে ফেরাউনের গোটা রাজ শক্তির রোষানলে

পড়বে এবং তাকে শুধু তার সম্মান, মর্যাদা ও স্বার্থ হারাতে হবে তাই নয়, জীবনের আশাও ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এত কিছু বুঝতে পারা সত্ত্বেও তিনি শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে এ নাজুক সময়ে তার বিবেক যেটিকে তার কর্তব্য বলে মনে করেছে সে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৬১. এ থেকে জানা যায়, ফেরাউনের সাম্রাজ্যে সে ব্যক্তি এতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল যে, ভরা দরবারে ফেরাউনের মুখের ওপরে এ ধরনের সত্য কথন সত্ত্বেও তাকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেয়ার সাহস হয়নি। এ কারণে তাকে হত্যা করার জন্য ফেরাউন ও তার সহযোগীদের গোপনে ষড়যন্ত্র করতে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ সে ষড়যন্ত্রও বাস্তবায়িত হতে দেননি।

৬২. এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমানদার ব্যক্তির সত্য কথনের এ ঘটনা হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের একেবারে শেষ যুগে সংঘটিত হয়েছিল। সম্ভবত এ দীর্ঘ দ্বন্দ্ব–সংঘাতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ফেরাউন হযরত মূসাকে হত্যা করার সংকল্প করে থাকবে। কিন্তু তার সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী এ ব্যক্তির সত্য কথনের কারণে সে হয়তো আশঙ্কা করেছিলো যে, মূসা আলাইহিস সালামের প্রভাব সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের ওপরেও পড়েছে। হয়তো এ কারণেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, মূসার (আ) বিরুদ্ধে এ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই সাম্রাজ্যের আমীর, উমরা ও উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী লোকদের মধ্যে যারা এ আন্দোলনে প্রভাবিত হয়েছে সেসব লোকদের খুঁজে বের করা হোক যাতে তাদের মূলোৎপাটনের পর মূসাকে হত্যা করা যায়। কিন্তু সে এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকাকালেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও তাঁর অনুসারীদের হিজরতের আদেশ দিলেন। আর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে ফেরাউন তার সৈন্য–সামন্তসহ ডুবে মারা যায়।

৬৩. বহু সংখ্যক হাদীসে কবরের আযাব নামক বরযখের আযাবের যে উল্লেখ আছে এ আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় আযাবের দু'টি পর্যায়ের উল্লেখ করছেন। একটি হচ্ছে কম মাত্রার আযাব যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ফেরাউনের অনুসারীদের দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় দোযখের আগুনের সামনে পেশ করা হয় আর ঐ আগুন দেখে তারা সর্বক্ষণ আতংকিত হয়ে কাটায় এই ভেবে যে, এ দোযখেই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। এরপর কিয়ামত আসলে তাদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত বড় এবং সত্যিকার আযাব দেয়া হবে। ডুবে মরার সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরকে যে আযাবের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখানো হবে। এ ব্যাপারটি শুধু ফেরাউন ও ফেরাউনের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। অপরাধীদের জন্য যে জঘন্য পরিণাম অপেক্ষা করছে, মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সবাই সে দৃশ্য দেখতে পায় আর সমস্ত সৎকর্মশীল লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে শুভ পরিণাম প্রস্তুত করে রেখেছেন তার সুন্দর দৃশ্যও তাদেরকে দেখানো হয়। বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنٰتِ ۖ قَالُوا بَلٰى ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

বড়ত্বের দাবীদাররা বলবেঃ আমরা সবাই এখানে একই অবস্থায় আছি। আর আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে ফায়সালা করে দিয়েছেন।[৬৫] দোযখে নিক্ষিপ্ত এসব লোক জাহান্নামের কর্মকর্তাদের বলবে ঃ "তোমাদের রবের কাছে দোয়া করো তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের আযাব হ্রাস করেন।" তারা বলবে, "তোমাদের রসূলগণ কি তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসেননি?" "তারা বলবে হ্যাঁ।" জাহান্নামের কর্মকর্তারা বলবে ঃ "তাহলে তোমরাই দোয়া করো। তবে কাফেরদের দোয়া ব্যর্থই হয়ে থাকে।"[৬৬]

ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة ، وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل اليه يوم القيامة –

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই মারা যায় তাকেই সকাল ও সন্ধায় তার শেষ বাসস্থান দেখানো হতে থাকে। জান্নাতী ও দোযখী উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি হতে থাকে। তাকে বলা হয় কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন, তখন তোমাকে আল্লাহ যে জায়গা দান করবেন, এটা সেই জায়গা।"

(অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, আয়াত ৯৭; আল আন'আম, ৯৩, ৯৪; আল আনফাল ৫০; আন নাহল ২৮, ৩২; আল মু'মিনূন, ৯৯, ১০০; ইয়াসীন ২৬, ২৭; টীকা ২২ ও ২৩; মুহাম্মাদ ২৭, টীকা ৩৭)।

৬৪. তারা এমন কোন আশা নিয়ে একথা বলবে না যে, তাদের ঐ সব পূর্বতন নেতা কিংবা শাসক বা পথপ্রদর্শক প্রকৃতই তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে বা তা

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَٰءِيلَ الْكِتَٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَٰبِ ﴿٥٤﴾

৬ রুকূ'

নিশ্চিত জানো, আমি এ পার্থিব জীবনে আমার রসূল ও ঈমানদারদের অবশ্যই সাহায্য করি[৬৭] এবং যেদিন সাক্ষীদের পেশ করা হবে[৬৮] সেদিনও করবো। যেদিন ওজর ও যুক্তি পেশ জালেমদের কোন উপকারে আসবে না, তাদের ওপর লা'নত পড়বে এবং তাদের জন্য হবে জঘন্যতম ঠিকানা। অবশেষে দেখো, আমি মূসাকে পথনির্দেশনা দিয়েছিলাম[৬৯] এবং বনী ইসরাঈলদের এমন এক কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি যা ছিল বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্য হিদায়াত ও নসিহত।[৭০]

কিছুটা লাঘব করিয়ে দেবে। তখন তাদের কাছে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এখানে এসব লোক আমাদের কোন কাজে আসার মত নয়। তারা তাদেরকে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্য তাদেরকে বলবে ঃ দুনিয়ায় তো জনাব অত্যন্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ফলিয়ে আমাদের ওপর আপনার নেতৃত্ব চালাতেন। আপনাদের কল্যাণে এখন এখানে যে বিপদ আমাদের ওপর আপতিত তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন তো দেখি।

৬৫. অর্থাৎ আমরা ও তোমরা সবাই সাজাপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর আদালত থেকে যার যে সাজা প্রাপ্য তা পেয়ে গেছি। তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা কিংবা তাঁর দেয়া শাস্তি হ্রাস বৃদ্ধি করার সাধ্য কারো নেই।

৬৬. অর্থাৎ ঘটনা যখন এই যে, রসূল তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। আর তোমরা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার (কুফরী) করেছিলে সে কারণে সাজা প্রাপ্ত হয়ে এখানে এসেছো তখন আমাদের পক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ, এ ধরনের দোয়ার জন্য কোন না কোন ওজর বা যুক্তি থাকা চাই। কিন্তু তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন ওজর বা যুক্তি পেশের সুযোগ আগেই নষ্ট করে ফেলেছো। এ অবস্থায় তোমরা নিজেরা দোয়া করতে চাইলে করে দেখো। তবে আমরা তোমাদেরকে প্রথমেই একথা বলে দিতে চাই যে, তোমাদের মত কুফরী করে যারা এখানে এসেছে তাদের দোয়া করা একেবারেই নিরর্থক।

৬৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস সাফ্‌ফাত, টীকা ৯৩।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝٥٥ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝٥٦

অতএব, হে নবী, ধৈর্যধারণ করো।[৭১] আল্লাহর ওয়াদা সত্য,[৭২] নিজের ভুল–ত্রুটির জন্য মাফ চাও[৭৩] এবং সকাল সন্ধ্যা নিজের রবের প্রশংসার সাথে সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।[৭৪] প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যারা তাদের কাছে আসা যুক্তি–প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করছে তাদের মন অহংকারে ভরা[৭৫] কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে তারা তার ধারেও ঘেঁষতে পারবে না।[৭৬] তাই আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো[৭৭] তিনি সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।

৬৮. অর্থাৎ যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে এবং তাঁর সামনে সাক্ষী পেশ করা হবে।

৬৯. অর্থাৎ আমি মূসাকে (আ) ফেরাউনের মোকাবিলায় পাঠিয়ে তাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়েছিলাম না। বরং প্রতি পদে আমি তাকে পথনির্দেশনা দিচ্ছিলাম এবং এভাবে তাকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। একথাটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে। ইংগিতটি হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি তোমার সাথেও একই আচরণ করবো। তোমাকেও মক্কা নগরীতে কুরাইশ গোত্রের মধ্যে নবুয়াত দিয়ে পাঠানোর পর তোমাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেইনি যে, এ জালেমরা তোমার সাথে যেমন ইচ্ছা আচরণ করবে। বরং আমি নিজে তোমার পৃষ্ঠপোষক আছি এবং তোমাকে পথনির্দেশনা দান করছি।

৭০. অর্থাৎ যেভাবে মূসার (আ) দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা এ নিয়ামত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান পোষণকারী বনী ইসরাঈলকেই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে তেমনিভাবে এখন যারা তোমাকে অস্বীকার করবে তারা বঞ্চিত হবে এবং তোমার প্রতি ঈমান পোষণকারীরাই কুরআনের উত্তরাধীকারী এবং পৃথিবীতে হিদায়াতের পতাকাবাহী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে।

৭১. অর্থাৎ তুমি যে পারিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছো তা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে প্রশান্ত মনে বরদাশত করতে থাকো।

৭২. "আমি এ পার্থিব জীবনেও আমার রসূল ও ঈমানদারদের অবশ্যই সাহায্য করি।" একটু আগেই ওপরে বর্ণিত এ বাক্যাংশের প্রতিশ্রুতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৭৩. যে প্রসংগে একথা বলা হয়েছে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, এ ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে ধৈর্যহীনতার সে পরিস্থিতিকে যখন চরম বিরোধিতার সে পরিবেশে বিশেষ করে তাঁর সংগী সাথীদেরকে ক্রমাগত নির্যাতিত হতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিলো। তিনি চাচ্ছিলেন শীঘ্রই এমন মু'জিযা দেখিয়ে দিতে যা দেখে কাফেররা স্বীকার করে নেবে কিংবা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে এমন কিছু প্রকাশ পাক যা দেখে বিরোধিতার এ আগুন নিভে যায়। এ ধরনের আকাংখা পোষণ কোন গোনাহ ছিল না যে, সে জন্য তাওবা ও ইসতিগফারের প্রয়োজন পড়তো। তবে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) যে উচ্চ আসনে সমাসীন করেছিলেন এবং সে পদমর্যাদা যে উচ্চ ও মহত সংকল্পের দাবি করে সে দিকের বিচারে এ যৎসামান্য ধৈর্যচ্যুতিও আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদার চেয়ে অনেক নীচু মনে হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, এ দুর্বলতার জন্য তোমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং পাথরের মত অটল হয়ে স্বীয় ভূমিকায় এমন অবিচল থাকো যেমনটি তোমার মত মহত মর্যাদার লোকদের হওয়া প্রয়োজন।

৭৪. অর্থাৎ এ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করাই সে উপায় যার মাধ্যমে আল্লাহর পথের কর্মীরা আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করে। সকাল ও সন্ধ্যায় 'হামদ' ও 'তাসবীহ' বা প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সদা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। দুই, এ নির্দিষ্ট সময় দু'টিতে নামায আদায় করো। দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা এ সূরা নাযিল হওয়ার কিছুদিন পর সমস্ত ঈমানদারদের জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছিল। কারণ, আরবী ভাষায় عشى শব্দটি সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের প্রথম অংশ পর্যন্ত সময় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ সময়ের মধ্যে যোহর থেকে শুরু করে এশা পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামায অন্তরভুক্ত। আর ابكار শব্দটি ভোর বেলায় উষার আলো প্রকাশ পাওয়ার সময় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে অর্থাৎ ফজরের নামাযের ওয়াক্তকে বলা হয়। (অধিক বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৫, ৫৯, ৬০, ২৬৩; হূদ, টীকা ১১৩; আল হিজ্‌র, টীকা ৫৩; বনী ইসরাঈল, ভূমিকা এবং টীকা ১, ৯১ থেকে ৯৮; ত্বা-হা, টীকা ১১১; আন নূর, টীকা ৮৪ থেকে ৮৯; আল আনকাবূত, টীকা ৭৬ থেকে ৭৯; আর রূম, টীকা ২৪, ৫০)।

৭৫. অর্থাৎ এসব লোকের যুক্তি-প্রমাণহীন বিরোধিতা এবং যুক্তিহীন কূট তর্কের মূল কারণ এ নয় যে, আল্লাহর আয়াতসমূহে যেসব সত্য এবং কল্যাণের কথা তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তা তাদের বোধগম্য হয় না। সুতরাং তারা তা বুঝার জন্য সৎ নিয়তে তর্কে লিপ্ত হয়। বরং তাদের এহেন আচরণের মূল কারণ হচ্ছে, তাদের মনের গর্ব ও অহংকার একথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যে, তারা থাকতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা মেনে নেয়া হবে এবং একদিন তাদের নিজেদেরকেও এ ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে, যার তুলনায় নিজেদেরকেই তারা নেতৃত্বের অধিক উপযুক্ত মনে করে। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সে জন্য তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জঘন্য থেকে জঘন্যতর কোন কৌশল কাজে লাগাতেও তারা দ্বিধান্বিত নয়।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِىْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

মানুষ[৭৮] সৃষ্টি করার চেয়ে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা নিসন্দেহে অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।[৭৯] অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এক রকম হতে পারে না এবং ঈমানদার ও সৎকর্মশীল সমান হতে পারে না। কিন্তু তোমরা কমই বুঝতে পারো।[৮০] কিয়ামত নিশ্চয়ই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।[৮১]

তোমাদের[৮২] রব বলেন : আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।[৮৩] যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৮৪]

৭৬. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ যাকে বড় বানিয়েছেন সে-ই বড় হয়ে থাকবে এবং এসব ছোট লোক নিজেদের বড়ত্ব কায়েম রাখার জন্য যে চেষ্টা–সাধনা করছে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

৭৭. অর্থাৎ ফেরাউনের হুমকির মুখে মহাপরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে মূসা (আ) যেমন চিন্তা মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তেমনি কুরাইশ নেতাদের হুমকি ও ষড়যন্ত্রের মুখে তুমিও তাঁর আশ্রয় নাও এবং চিন্তামুক্ত হয়ে তাঁর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাও।

৭৮. ওপরে সাড়ে তিনটি রুকূ'তে কুরাইশ নেতাদের ষড়যন্ত্রসমূহ পর্যালোচনা করার পর এখান থেকে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যেসব সত্য মেনে নেয়ার আহবান জানাচ্ছেন তা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসংগত। তা মেনে নেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ এবং না মানা তোমাদের জন্য ধ্বংসাত্মক। এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের

কথা বলে তার সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। কারণ, কাফেরদের কাছে এ বিশ্বাস ছিল অদ্ভুত। একে তারা দুর্বোধ্য ও জ্ঞান–বুদ্ধির পরিপন্থী বলে মনে করতো।

৭৯. এটি আখেরাত সম্ভব হওয়ার প্রমাণ। কাফেরদের ধারণা ছিল যে, মৃত্যুর পর মানুষের পুনরায় জীবিত হওয়া অসম্ভব। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যারা এ ধরনের কথা বলে তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ। যদি জ্ঞান–বুদ্ধি কাজে লাগানো হয় তাহলে একথা বুঝা তাদের জন্য মোটেই কঠিন নয় যে, যে আল্লাহ এ বিশ্ব–জাহান বানিয়েছেন মানুষকে পুনরায় জীবিত করা তাঁর জন্য কোন কঠিন কাজ হতে পারে না।

৮০. এটি আখেরাতের অনিবার্যতার প্রমাণ। ওপরের আয়াতাংশে বলা হয়েছিলো যে, আখেরাত হতে পারে তা হওয়া অসম্ভব নয়। আর এ আয়াতাংশে বলা হচ্ছে যে, আখেরাত হওয়া অনিবার্য, অবধারিত। জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবী হলো তা হতেই হবে। তা হওয়া নয়, না হওয়াই জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী। কোন যুক্তিবাদী মানুষ কি কখনো একথা সঠিক বলে মেনে নিতে পারে যে, যারা পৃথিবীতে অন্ধদের মত জীবন যাপন করে এবং নিজেদের দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম দ্বারা আল্লাহর পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করে তোলে তারা তাদের ভুল আচার আচরণ ও কর্মকাণ্ডের কোন খারাপ পরিণাম আদৌ দেখবে না এবং অনুরূপ যারা দুনিয়াতে ভালমন্দ বিচার করে চলে এবং ঈমান গ্রহণ করে নেক কাজ করে, তারা নিজেদের এ উত্তম কর্মকাণ্ডের কোন ভাল ফলাফল থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে? এ বিষয়টি যদি জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী হয় তাহলে আখেরাত অস্বীকৃতির আকীদাও অবশ্যই জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী হতে হবে। কারণ, আখেরাত না হওয়ার অর্থ হচ্ছে ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেণীর মানুষ মরে মাটিতে মিশে যাওয়া এবং উভয়ের একই পরিণতি লাভ করা। এরূপ হলে শুধু জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফকেই হত্যা করা হয় না, বরং নৈতিকতাও মূলোৎপাটিত হয়। কারণ, ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেণীর মানুষের যদি একই পরিণাম হয় তাহলে মন্দ লোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এ কারণে যে, তারা মৃত্যুর পূর্বে হৃদয়–মনের সমস্ত কামনা বাসনা পূরণ করেছে। আর সৎলোকেরা অত্যন্ত নির্বোধ এ কারণে যে, তারা অযথা নিজেদের ওপরে নানা রকমের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে রেখেছিলো।

৮১. এটা হচ্ছে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা। এ ধরনের ঘোষণা যুক্তি–তর্কের ভিত্তিতে দেয়া যায় না শুধু জ্ঞানের ভিত্তিতেই দেয়া যায়। আর আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য কোন বাণীতে এ বিষয়টি এমন অকাট্যভাবে বর্ণিত হতে পারে না। অহী বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞান–বুদ্ধির উদ্ভাবনী ক্ষমতা, যা বলা যেতে পারে, তা শুধু এতটুকু যে, আখেরাত সংঘটিত হতে পারে এবং হওয়া উচিত। এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে একথা কেবল সে মহান সত্তাই বলতে পারেন যার জানা আছে যে, আখেরাত হবে। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এমন সত্তা আর কেউ নেই। এখানে এসেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অনুমান ও যুক্তি–তর্কের পরিবর্তে নির্ভুল জ্ঞানের ওপর যদি দীনের ভিত্তি স্থাপিত হয় তবে তা হতে পারে শুধু আল্লাহর অহীর মাধ্যমে।

৮২. আখেরাতের আলোচনার পর এখন তাওহীদ সম্পর্কে বক্তব্য শুরু হচ্ছে। আর এটি ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মাঝে বিরোধের দ্বিতীয় বিষয়।

৮৩. অর্থাৎ দোয়া কবুল করা না করার সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আমার কাছে। অথবা তোমরা অন্যদের কাছে দোয়া করো না, আমার কাছে দোয়া করো। এ আয়াতটির মূল ভাবধারা সঠিকভাবে বুঝতে হলে তিনটি বিষয় ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

প্রথমত, মানুষ দোয়া করে কেবল সে সত্তার কাছে যাকে সে سميع (সর্বশ্রোতা), بصير (সর্বদ্রষ্টা) এবং অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার (Super natural powers) অধিকারী মনে করে। মূলত মানুষের আভ্যন্তরীণ অনুভূতি তাকে দোয়া করতে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুজগতের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যখন তার কোন কষ্ট নিবারণ কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোন অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী সত্তার কাছে ধর্ণা দেয়া অপরিহার্য। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং না দেখেই সে সত্তাকে ডাকে; প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি জায়গায় এবং সর্বাবস্থায় ডাকে। একাকী নির্জনে ডাকে, উচ্চস্বরেই শুধু নয়, চুপে চুপেও ডাকে এবং মনে মনেও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তা হয়। বিশ্বাসটি হচ্ছে, সেই সত্তা তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখছেন। তাঁর মনের কথাও শুনছেন। তিনি এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন, তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরায় তৈরী করতে পারেন। দোয়ার এ তাৎপর্য অনুধাবন করার পর মানুষের জন্য একথা বুঝা আর কঠিন থাকে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে সাহায্যের জন্য ডাকে সে প্রকৃতই নিরেট নির্ভেজাল এবং স্পষ্ট শিরকে লিপ্ত হয়। কারণ, যেসব গুণাবলী কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা সেসব সত্তার মধ্যেও আছে বলে সে বিশ্বাস করে। সে যদি তাদেরকে ঐ সব খোদায়ী গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক না করতো তাহলে তার কাছে দোয়া করার কল্পনা পর্যন্ত তার মনে কখনো আসতো না।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় যে কথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে নিজের থেকেই একথা মনে করে বসে যে, সে অনেক ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক তাহলে অনিবার্য রূপেই সে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হয়ে যায় না। ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হওয়া একটি বাস্তব ব্যাপার যা কারো মনে করা বা না করার ওপর নির্ভর করে না। আপনি মালিক মনে করেন আর না করেন প্রকৃতই যে ক্ষমতা ইখতিয়ারের মালিক সে সর্বাবস্থায়েই মালিক থাকবে। আর যে প্রকৃত মালিক নয় আপনি তাকে মালিক মনে করে বসলেও এ মনে করাটা তাকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অতি সামান্য অংশও দিতে পারবে না। এটা বাস্তব ও সত্য যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তাই সর্বশক্তিমান, বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপক ও শাসক এবং সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তিনিই সামগ্রিকভাবে সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক। সমগ্র বিশ্ব-জাহানে দ্বিতীয় এমন কোন সত্তাই নেই, যে দোয়া শোনার কোন যোগ্যতা ও ইখতিয়ার রাখে বা তা কবুল করা বা না করার ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। মানুষ যদি এ বাস্তবতার পরিপন্থী কাজ করে নিজের পক্ষ থেকে নবী-রসূল, আওলিয়া, ফেরেশতা, জিন, গ্রহ-উপগ্রহ ও মনগড়া দেবতাদেরকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করে বসে তাতে বাস্তব অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তনও হবে না। মালিক মালিকই থাকবেন এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন দাস দাসই থেকে যাবে।

তৃতীয় কথাটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যদের কাছে প্রার্থনা করা হুবহু এমন যেন কোন ব্যক্তি দরখাস্ত লিখে নিয়ে রাজ প্রাসাদে গেল কিন্তু ক্ষমতার প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে সেখানে অন্য যেসব প্রার্থী নিজেদের অভাব পূরণের আশায় বসে আছে তাদের কারো সামনে দরখাস্ত পেশ করে করজোড়ে কাকুতি-মিনতি করে বলতে থাকলো। হুজুরই সবকিছু, এখানে তো আপনার হুকুমই চলে, আমার প্রয়োজন যদি আপনি পূরণ করেন তবেই পূরণ হতে পারে। প্রথমত এ আচরণ নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক কিন্তু তখন যদি প্রকৃত ক্ষমতার ও ইখতিয়ারের মালিক শাসক সামনে বিদ্যমান থাকেন আর তার উপস্থিতিতে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সামনে দরখাস্ত পেশ করে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করা হয় তাহলে এমন অবস্থায় তা চরম অশোভন ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ বলে পরিগণিত হয়। তাছাড়া এ অজ্ঞতা চরমে পৌঁছে তখন, যখন যে ব্যক্তির সামনে দরখাস্ত পেশ করা হচ্ছে সে নিজে তাকে বারবার একথা বুঝায় যে, আমিও তোমার মত একজন প্রার্থী। আমার কাছে কিছুই নেই। আসল শাসক তো সামনেই আছেন। তুমি তার কাছে দরখাস্ত পেশ কর। কিন্তু তার বুঝানো ও নিষেধ সত্ত্বেও এ নির্বোধ যদি বলতেই থাকে যে, আমার মালিক মনিব আপনি। আপনি যদি করে দেন তবেই আমার কাজ হবে। বস্তুত এরূপ অবস্থায়ই এ অজ্ঞতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এ তিনটি বিষয় মনে রেখে আল্লাহ তা'আলার বাণী "আমাকে ডাকো। তোমাদের ডাকে সাড়া দানকারী আমি। তা গ্রহণ করা আমার কাজ।" আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটি বুঝার চেষ্টা করুন।

৮৪. এ আয়াতের দু'টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি হচ্ছে, এখানে "দোয়া" ও "ইবাদাত" শব্দ দু'টিকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে যে জিনিসকে দোয়া শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যাংশে সে জিনিসকেই ইবাদাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দোয়াও ঠিক ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না এমন লোকদের জন্য "অহংকার ও গর্বভরে আমার ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়" কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর কাছে দোয়া করা বন্দেগী বা দাসত্বের দাবী। এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারে ডুবে আছে। এ কারণে নিজের স্রষ্টা ও মনিবের কাছে দাসত্বের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাণীতে আয়াতের এ দু'টি বিষয় পরিষ্কার বর্ণনা করেছেন। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন : .... إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ দোয়াই 'ইবাদাত'। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। (তোমরা আমাকে ডাকো আমি সাড়া দেবো। আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর)। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন : الدعاء مخ العبادة "দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের সারবস্তু" (তিরমিযী)। হযরত আবু হুরাইরা বলেন, নবী (সা) বলেছেন : من لم يسأل الله يغضب عليه "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন" (তিরমিযী)।

এ পর্যায়ে একটি সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় যা বহু সংখ্যক মানুষের মনে বেশীর ভাগ সময় দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে থাকে। দোয়া করার ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারা হলো, তাকদীরের ভাল–মন্দ যখন আল্লাহর ইখতিয়ারে তখন তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে ফায়সালা করেছেন সেটাই অনিবার্যরূপে ঘটবে। সুতরাং আমার দোয়া করার স্বার্থকতা কি? এটা একটা বড় রকমের ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মানুষের মন থেকে দোয়ার সমস্ত গুরুত্ব মুছে ফেলে। এ ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পড়ে থেকে মানুষ যদি দোয়া করেও সেসব দোয়ায় কোন প্রাণ থাকে না। কুরআন মজীদের এ আয়াতটি দুটি পন্থায় এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করে। প্রথমত, আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছেন, "আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।" এ থেকে জানা যায়, তাকদীর এমন কোন জিনিস নয়। আমাদের মত (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার হাত পাও বেঁধে দিয়েছে এবং তিনি দোয়া কবুল করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার হারিয়ে ফেলেছেন। নিসন্দেহে বান্দা আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহ এড়ানো বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু কোন বান্দার দোয়া ও আবেদন নিবেদন শুনে আল্লাহ নিজে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন। এ আয়াতে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে তা হলো, দোয়া কবুল হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তার একটি ছোট বা বড় ফায়দা থাকে কোন অবস্থায়ই তা ফায়দাহীন নয়। সে ফায়দা হলো, বান্দা তার প্রভুর সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজন পেশ এবং দোয়া করে তাঁর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতা স্বীকার করে। নিজের দাসত্বের এ স্বীকৃতিই যথাস্থানে একটি ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণসত্তা। বান্দা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করলো সেই বিশেষ জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক কোন অবস্থায়ই সে তার এ দোয়ার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না।

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা পেয়ে যাই। নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো প্রথমোক্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে।

হযরত সালমান ফারসী থেকে বর্ণিত নবী (সা) বলেছেন : لا يرد القضاء الا الدعاء(ترمذى) "দোয়া ছাড়া আর কোন কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না" অর্থাৎ কোন কিছুর মধ্যেই আল্লাহর ফায়সালা পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহ নিজে তাঁর ফায়সালা পরিবর্তন করতে পারেন। আর এটা হয় কেবল তখনি যখন বান্দা তাঁর কাছে দোয়া করে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سال او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع با ثم او قطيعة رحم (ترمذى)

"বান্দা যখনই আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন কিংবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন—যদি সে গোনাহর কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে।"

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আরেকটি প্রায় অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه اللّه احدى ثلث ، اما ان يعجل له دعوته ، واما ان يدخرها له فى الا خرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها (مسند احمد)

"একজন মুসলমান যখনই কোন দোয়া করে তা যদি কোন গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা তিনটি অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দোয়া এ দুনিয়াতেই কবুল করা হয়, নয়তো আখেরাতে প্রতিদান দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার ওপরে ঐ পর্যায়ের কোন বিপদ আসা বন্ধ করা হয়।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفرلى ان شيئت ، ارحمنى ان شئت ، ارزقنى ان شئت ، وليغزم مسئلته (بخارى)

"তোমাদের কোন ব্যক্তি দোয়া করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে; "হে আল্লাহ, আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকেই আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির ভাষা হচ্ছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

ادعوا اللّه وانتم موقنون بالاجابة (ترمذى)

"আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করো।"

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন যে,

يستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطيعة رحم مالم يستعجل ، قيل يا رسول اللّه ما الاستعجال ؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم اريستجاب لى فيستحسر عند ذلك و يدع الدعاء (مسلم)

"যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দোয়া কবুল করা হয়।" জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহর রসূল,

তাড়াহুড়ো কি? তিনি বললেন : তাড়াহুড়ো হচ্ছে ব্যক্তির একথা বলা যে, "আমি অনেক দোয়া করেছি। কিন্তু দেখছি আমার কোন দোয়াই কবুল হচ্ছেনা। এভাবে সে অবসন্ন গ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়।"

দ্বিতীয় বিষয়টিও নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন :

ليس شيئ اكرم على الله من الدعاء (ترمذى ، ابن ماجة)

"আল্লাহর কাছে দোয়ার চাইতে অধিক সম্মানার্হ জিনিস আর কিছুই নেই।"

হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

سلوا الله من فضله فان الله يحب ان يسأل (ترمذى).

"আল্লাহর কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন।"

হযরত ইবনে উমর (রা) ও মু'আয ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন :

ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء

(ترمذى ، مسند احمد)

"যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। অতএব হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য।" (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন :

يسأل احدكم ربه حاجته كله حتى يسأل شسع نعله اذا انقطع

(ترمذى)

"তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার রবের কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।"

অর্থাৎ মানুষ যে ব্যাপারগুলো বাহ্যত নিজের ইখতিয়ারভুক্ত বলে মনে করে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের আগে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে। কারণ, কোন ব্যাপারে আমাদের কোন চেষ্টা–তদবীরই আল্লাহর তাওফিক ও সাহায্য ছাড়া সাফল্য লাভ করতে পারে না। চেষ্টা–তদবীর শুরু করার আগে দোয়া করার অর্থ হচ্ছে , বান্দা সর্বাবস্থায় তার নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾ كَذٰلِكَ یُؤْفَكُ الَّذِیْنَ كَانُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٦٤﴾

৭ রুকূ'

আল্লাহই তো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা রাতের বেলা আরাম করতে পারো। আর দিনকে আলোকিত করেছেন। সত্য এই যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুকম্পাশীল। তবে অধিকাংশ লোক শুকরিয়া আদায় করে না।[৮৫] সে আল্লাহই (যিনি তোমাদের জন্য এসব করেছেন) তোমাদের রব, সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।[৮৬] তোমাদেরকে কোন্ দিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?[৮৭] এভাবেই সেসব লোককে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।[৮৮]

আল্লাহই তো সেই সত্তা যিনি পৃথিবীকে অবস্থানস্থল বানিয়েছেন[৮৯] এবং ওপরে আসমানকে গম্বুজ বানিয়ে দিয়েছেন।[৯০] যিনি তোমাদের আকৃতি নির্মাণ করেছেন এবং অতি উত্তম আকৃতি নির্মাণ করেছেন। যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসের রিযিক দিয়েছেন।[৯১] সে আল্লাহই (এগুলো যার কাজ) তোমাদের রব। অপরিসীম কল্যাণের অধিকারী তিনি। বিশ্ব–জাহানের রব তিনি।

৮৫. এ আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তরভুক্ত হয়েছে। প্রথমত এতে রাত ও দিনকে তাওহীদের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কারণ, রাত ও দিনের নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগমনের অর্থ পৃথিবী ও সূর্যের ওপর একই আল্লাহর শাসন চলছে। আর তার ঘুরে ফিরে আসা এবং পৃথিবীর আর সব সৃষ্টির জন্য উপকারী হওয়া এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এক মাত্র আল্লাহই এসব জিনিসের স্রষ্টাও। তিনি তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের

জ্ঞান ও কৌশল দ্বারা এমনভাবে এ ব্যবস্থা চালু করেছেন যাতে তাঁর সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর হয়। দ্বিতীয়ত, এতে আল্লাহকে অস্বীকারকারী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী মানুষদেরকেও এ অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, রাত ও দিনের আকারে আল্লাহ তাদেরকে কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু তারা কত বড় অকৃতজ্ঞ যে, তাঁর এ নিয়ামত নিজেদের কল্যাণে কাজে লাগিয়েও তারা দিন–রাত চব্বিশ ঘন্টা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিশ্বাসহীনতার কাজ করে যাচ্ছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা ইউনুস, টীকা ৬৫; আল ফুরকান, টীকা ৭৭; আন নামল, টীকা ১০৪; আল কাসাস, টীকা ৯১; আর রূম, টীকা ৩৬; লোকমান, আয়াত ২৯; টীকা ৫০; ইয়াসীন, আয়াত ৩৭, টীকা ৩২)।

৮৬. অর্থাৎ রাত ও দিনের ঘুরে ফিরে আসা প্রমাণ করে যে, তিনিই তোমাদের ওসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তাছাড়া এ আবর্তনের মধ্যে তোমাদের জীবনের জন্য যে বিরাট কল্যাণ নিহিত আছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তোমাদের অত্যন্ত দয়াবান পালনকর্তা। সুতরাং একথা আপনা থেকেই নিসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, তোমাদের প্রকৃত উপাস্যও তিনিই। তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা হবেন আল্লাহ আর উপাস্য হবে অন্য কেউ এটা জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৮৭. অর্থাৎ যে তোমাদের স্রষ্টাও নয় পালনকর্তাও নয় সে তোমাদের ইবাদাত তথা দাসত্ব পাওয়ার অধিকারী হবে একথা বলে তোমাদেরকে কে বিভ্রান্ত করছে?

৮৮. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই সাধারণ মানুষ শুধু এ কারণে এসব বিভ্রান্তকারীদের ধোঁকাবাজির শিকার হয়েছে যে, সত্য বুঝানোর জন্য আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে আয়াত নাযিল করেছেন মানুষ তা মানেনি। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তারা সেসব স্বার্থপর ধোঁকাবাজদের জালে আটকে পড়েছে যারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য নকল খোদার আস্তানা বানিয়ে বসেছিল।

৮৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৪, ৭৫।

৯০. অর্থাৎ তোমাদেরকে খোলা আকাশের নিচে এমনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, মহাশূন্যের বিপদাপদ বৃষ্টির মত বর্ষিত হয়ে তোমাদেরকে তছনছ করে দেবে। বরং পৃথিবীর ওপরে একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা কায়েম করে দিয়েছেন (যা দেখতে গম্বুজের মত মনে হয়)। এ ব্যবস্থাপনা অতিক্রম করে কোন ধ্বংসাত্মক বস্তুই তোমাদের কাছে পৌছতে পারে না। এমনকি মহাশূণ্যের প্রাণ সংহারী রশ্মিসমূহও পৌছতে পারে না। এ কারণেই তোমরা নিরাপদে আরামে এ পৃথিবীতে বেঁচে আছ।

৯১. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বেই এমন সুরক্ষিত ও নিরাপদ অবস্থানস্থল প্রস্তুত করেছেন। তারপর তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটি সর্বোত্তম দেহ–কাঠামো, উপযুক্ত অংগ–প্রত্যংগ এবং উন্নত দৈহিক ও চিন্তা শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ সরল সোজা দেহ কাঠামো, হাত পা, চোখ নাক, এবং কান, বাকশক্তি সম্পন্ন এ জিহবা এবং সর্বোত্তম যোগ্যতার ভাণ্ডার এ মস্তিষ্ক তোমরা নিজে তৈরী করে আননি, তোমাদের বাবা–মাও তৈরী করেনি, কোন নবী, অলী কিংবা দেবতার মধ্যেও তা তৈরী করার ক্ষমতা ছিল না। এসব যোগ্যতা ও ক্ষমতার সৃষ্টিকারী ছিলেন সে মহাজ্ঞানী,

هُوَ الْحَيُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّي ۚ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٦﴾

তিনি চিরঞ্জীব।[৯২] তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমাদের দীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো।[৯৩] গোটা সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা।[৯৪]

হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো আমাকে সেসব সত্তার দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৯৫] (আমি কি করে এ কাজ করতে পারি) আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন গোটা বিশ্ব–জাহানের রবের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি।

দয়ালু ও সর্বশক্তিমান সত্তা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করার সময় পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তাকে এ নজীরবিহীন দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতপর জন্মলাভ করার সাথে সাথে তাঁর দয়ায় তোমরা প্রচুর পবিত্র খাদ্য পেয়েছো, পানাহারের এমন সব পবিত্র উপকরণ লাভ করেছো যা বিষাক্ত নয়, সুস্বাস্থ্য দায়ক, তিক্ত, নোংরা ও বিস্বাদ নয় বরং সুস্বাদু, পচা গলা ও দুর্গন্ধ নয় বরং সুবাসিত খাদ্য প্রাণহীন নয়, বরং তোমাদের দেহের লালন ও প্রবৃদ্ধির জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী খাদ্য প্রাণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানে সমৃদ্ধ। পানি, খাদ্য, শস্য, তরকারী, ফলমূল, দুধ, মধু, গোশত, লবণ, মরিচ ও মসলা তোমাদের পুষ্টি সাধনের জন্য এসব অত্যন্ত উপযোগী এবং জীবনদায়িনী শক্তিই শুধু নয়, বরং জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদলাভের জন্যও অত্যন্ত উপযোগী। এ পৃথিবীতে এসব জিনিস কে এত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করেছে, ভূমি থেকে খাদ্যের এ অগণিত ভাণ্ডার উৎপাদনের এ ব্যবস্থা কে করেছে যে, তার যোগান কখনো বন্ধ হয় না? চিন্তা করে দেখো, রিযিকের এ ব্যবস্থা না করেই যদি তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হতো তাহলে তোমাদের জীবনের পরিস্থিতি কি দাঁড়াতো? সুতরাং এটা কি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, তোমাদের স্রষ্টা শুধু স্রষ্টাই নন, বরং মহাজ্ঞানী স্রষ্টা এবং অত্যন্ত দয়ালু প্রভু? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা হূদ, টীকা ৬ ও ৭, আন নাম্‌ল, টীকা ৭৩ থেকে ৮৩)।

৯২. অর্থাৎ তাঁর জীবনই বাস্তব ও প্রকৃত জীবন। একমাত্র তিনিই আপন ক্ষমতায় জীবিত। তাঁর জীবন ছাড়া আর কারো জীবনই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়। আর সবার জীবনই আল্লাহ প্রদত্ত, মরণশীল ও ধ্বংসশীল।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

তিনিই তো সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্র থেকে। তারপর রক্তের পিণ্ড থেকে। অতপর তিনি তোমাদেরকে শিশুর আকৃতিতে বের করে আনেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ শক্তিতে উপনীত হতে পারো। তারপর আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও। তোমাদের কাউকে আগেই ফিরিয়ে নেয়া হয়।[৯৬] এসব কাজ করা হয় এ জন্য যাতে তোমরা তোমাদের নির্ধারিত সময়ের সীমায় পৌছতে পারো[৯৭] এবং যাতে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারো।[৯৮] তিনিই প্রাণ সঞ্চারকারী এবং তিনিই মৃত্যুদানকারী। তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শুধু একটি নির্দেশ দেন যে, তা হয়ে যাক, আর তখনি তা হয়ে যায়।

৯৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আয যুমার, টীকা ৩ ও ৪।

৯৪. অর্থাৎ দ্বিতীয় আর কেউ নেই যার প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করা যেতে পারে এবং যার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেতে পারে।

৯৫. এখানে পুনরায় 'ইবাদাত' ও দোয়াকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৯৬. অর্থাৎ কেউ জন্মলাভের পূর্বে, কেউ যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে এবং কেউ বৃদ্ধাবস্থায় পৌছার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে থাকে।

৯৭. নির্ধারিত সময়ের অর্থ মৃত্যুর সময় অথবা সে সময় যখন পুনরায় জীবিত হওয়ার পর সমস্ত মানুষকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। প্রথম অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়ে সে বিশেষ সময় পর্যন্ত নিয়ে যান যা তিনি প্রত্যেক মানুষের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। বিশেষ সে মুহূর্তটি আসার পূর্বে যদি গোটা দুনিয়ার মানুষ মিলিত হয়েও তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে তবুও হত্যা করতে পারবে না। আবার সে মুহূর্তটি এসে যাওয়ার পর দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মিলিত হয়েও যদি কাউকে জীবিত রাখার জন্য চেষ্টা করে তবুও সফল হতে পারবে না। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে এ পৃথিবীতে

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ۝٦٩ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٧٠ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ۝٧١ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۝٧٢

৮ রুকূ'

তুমি কি সেসব লোকদের দেখনি যারা আল্লাহর বিধানাবলী নিয়ে ঝগড়া করে, তাদেরকে কোথা থেকে ফিরানো হচ্ছে?[৯৯] *যারা এ কিতাবকে অস্বীকার করে এবং আমি আমার রসূলদের যা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম*[১০০] *তাও অস্বীকার করে? এসব লোক অচিরেই জানতে পারবে যখন তাদের গলায় থাকবে গ্রীবা বন্ধনী ও শৃঙ্খল, এসব ধরে টানতে টানতে তাদেরকে ফুটন্ত পানির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।*[১০১]

তোমাদেরকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, তোমরা মরে মাটিতে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং তিনি তোমাদেরকে জীবনের এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এ জন্য অতিক্রম করান যাতে তাঁর নির্ধারিত সময়ে তোমরা তার সামনে হাজির হও।

৯৮. অর্থাৎ জীবনের এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে অতিক্রম করানোর কারণ এ নয় যে, তোমরা পশুর মত জীবন যাপন করবে এবং পশুর মত মরবে। বরং এসব পর্যায় অতিক্রম করানো হয় এ জন্য যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যে জ্ঞান–বুদ্ধি দিয়েছেন তা কাজে লাগাবে এবং সে নিয়ম–নীতি ও ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করবে যার অধীনে তোমাদের আপন সত্তার ওপর দিয়ে এসব আবার আবর্তন চলে। মাটির প্রাণহীন উপাদানসমূহের মধ্যে জীবনের মত বিস্ময়কর ও অদ্ভুত জিনিসের উৎপত্তি হওয়া, কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টি–গোচর হয় এমন অতি ক্ষুদ্র শুক্রকীট থেকে মানুষের মত বিস্ময়কর সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভ করা তারপর মাতৃগর্ভে স্থিতিকাল থেকে প্রসবকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই এমনভাবে বেড়ে ওঠা যে, তার লিংগ, তার আকার–আকৃতি, তার দৈহিক কাঠামো, তার মানসিক বৈশিষ্টাবলী এবং তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা সবকিছুই সেখানে নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার সৃষ্টির ব্যাপারে দুনিয়ার কোন শক্তিরই প্রভাব খাটাতে না পারা। তাছাড়া যার গর্ভপাত হয় তার গর্ভপাতের শিকার হওয়া, যে শিশুকালে মরে যায় তার শিশুকালেই মরে যাওয়া, যে যৌবনকালে বা বৃদ্ধাবস্থায় কোন নির্দিষ্ট বয়স সীমায় পৌছে তার এমন সব ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেও সে বয়সে উপনীত হওয়া যেসব পরিস্থিতিতে নিশ্চিত মৃত্যু হওয়া উচিত এবং যাকে বয়সের কোন এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে তার পৃথিবীর সর্বোত্তম কোন হাসপাতালে সুদক্ষ ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন থেকেও

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾ اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾

অতপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে; এখন তোমাদের সেসব ইলাহ কোথায় যাদেরকে তোমরা শরীক করতে।[১০২] তারা জবাব দেবে, তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। এর আগে আমরা যাদেরকে ডাকতাম তারা কিছুই না।[১০৩] আল্লাহ এভাবে কাফেরদের ভ্রষ্টতাকে কার্যকর করে দেবেন। তাদের বলা হবে, তোমাদের এ পরিণতির কারণ হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে অসত্য নিয়ে মেতে ছিলে এবং সে জন্য গর্ব প্রকাশ করতে।[১০৪] এখন অগ্রসর হয়ে জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ করো। তোমাদেরকে চিরদিন সেখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য তা অতীব জঘন্য জায়গা।

মৃত্যুবরণ করা। এসব বিষয় কি এ সত্যটিই তুলে ধরছে না যে, আমাদের জীবনও কোন এক সর্বশক্তিমান সত্তার হাতে? বাস্তব অবস্থা যখন এই যে, এক সর্বশক্তিমান সত্তা আমাদের জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী তখন কোন নবী, অলী, ফেরেশতা কিংবা তারকা বা গ্রহ-উপগ্রহ আমাদের ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য হয় কিভাবে? তাছাড়া কোন মানব শক্তি এ পদমর্যাদা কিভাবে লাভ করলো যে, আমরা তার আইন-কানুন, তার আদেশ-নিষেধ এবং তার নিজের নির্ধারিত হালাল-হারাম বিনা বাক্যে মেনে নেব? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা হজ্জ, টীকা ৯)।

৯৯. অর্থাৎ ওপরের বক্তব্য শোনার পরও কি তুমি একথা উপলব্ধি করতে পারনি যে, এসব লোকের ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত আচরণের মূল উৎস কোথায় এবং তারা কোথায় ঠোকর খেয়ে গোমরাহীর এ গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে? (প্রকাশ থাকে যে, এখানে তুমি শব্দটি দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং এ আয়াত ক'টি পাঠকারী ও শ্রবণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে)।

১০০. এটা হচ্ছে তাদের হোঁচট খাওয়ার মূল কারণ। তাদের কুরআন এবং আল্লাহর রসূলদের আনীত শিক্ষা না মানা এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে ঝগড়াটেপনা দিয়ে তার মোকাবেলা করা এসব মৌলিক

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ
بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

হে নবী, ধৈর্য অবলম্বন করো।[১০৫] আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে যে মন্দ পরিণতির ভয় দেখাচ্ছি এখন তোমার সামনেই এদেরকে তার কোন অংশ দেখিয়ে দেই কিংবা (তার আগেই) তোমাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেই, সর্বাবস্থায় এদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।[১০৬]

হে নবী,[১০৭] তোমার আগে আমি বহু রসূল পাঠিয়েছিলাম। আমি তাদের অনেকের কাহিনী তোমাকে বলেছি আবার অনেকের কাহিনী তোমাকে বলিনি। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা কোন রসূলেরই ছিল না।[১০৮] অতপর যখন আল্লাহর হুকুম এসেছে তখন ন্যায়সংগতভাবে ফায়সালা করা হয়েছে এবং ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[১০৯]

কারণই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে এবং তাদের সোজা পথে আসার সমস্ত সম্ভাবনা নিশেষ করে দিয়েছে।

১০১. অর্থাৎ তারা যখন তীব্র পিপাসায় বাধ্য হয়ে পানি চাইবে তখন দোযখের কর্মচারীরা তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে টেনে হেঁচড়ে এমন ঝর্ণাধারার দিকে নিয়ে যাবে, যা থেকে টগবগে গরম পানি বেরিয়ে আসছে। অতপর তাদের সে পানি পান করা শেষ হলে আবার তারা তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবে।

১০২. অর্থাৎ তারা যদি সত্যিই রব হয়ে থাকে কিংবা প্রভুত্বে শরীক থেকে থাকে এবং বিপদের মুহূর্তে তারা তোমাদের কাজে আসবে এ আশায় তোমরা তাদের দাসত্ব করে থাকো তাহলে এখন তারা তোমাদেরকে উদ্ধার করছে না কেন?

১০৩. একথার অর্থ এই নয় যে, আমরা দুনিয়াতে শির্‌ক করতাম না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এখন আমাদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দুনিয়ায় আমরা যাদের ডাকতাম তারা কিছুই ছিল না, নগণ্য ছিল, মূল্যহীন ছিল।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَیْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَیْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَیُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ ۖ فَاَیَّ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾

৯ রুকূ'

আল্লাহই তোমাদের জন্য এসব গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা এসব পশুর কোনটির পিঠে আরোহণ করতে পার এবং কোনটির গোশত খেতে পার। এসবের মধ্যে তোমাদের জন্য আরো অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। তোমাদের মনে যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় এসবের পিঠে আরোহণ করে তোমরা সেখানে পৌছতে পার। এসব পশু এবং নৌকাতেও তোমাদের আরোহণ করতে হয়। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর এসব নিদর্শন দেখাচ্ছেন। তোমরা তাঁর কোন্ কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে?[১১০]

১০৪. অর্থাৎ যা ন্যায় ও সত্য ছিল না তোমরা শুধু তার আনুগত্য ও অনুসরণ করেই ক্ষান্ত হওনি বরং সে অসত্য নিয়ে তোমরা এতটা মগ্ন ছিলে যে, তোমাদের সামনে ন্যায় ও সত্য পেশ করা হলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করনি এবং নিজেদের বাতিল পূজার জন্য উল্টো গর্ব করেছো।

১০৫. অর্থাৎ যারা ঝগড়া ও বিতর্ক দ্বারা তোমাদের মোকাবিলা করছে এবং হীন চক্রান্তের মাধ্যমে তোমাদেরকে হেয় করতে চাচ্ছে তাদের কথা ও আচরণের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।

১০৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তিই তোমাকে পরাভূত করার জন্য চেষ্টা করেছে তাকেই এ পৃথিবীতে এবং তোমার জীবদ্দশাতেই আমি শাস্তি দেবো তা জরুরী নয়। কেউ এখানে শাস্তি পাক বা না পাক সে আমার শাস্তি থেকে কোন অবস্থায়ই রক্ষা পেতে পারে না। মৃত্যুর পর তাকে আমার কাছেই আসতে হবে। তখন সে তার কৃতকর্মের পুরো শাস্তি ভোগ করবে।

১০৭. এখান থেকে ভিন্ন একটি বিষয় শুরু হচ্ছে। মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, আমাদের দাবিকৃত মু'জিযা না দেখানো পর্যন্ত আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে মেনে নিতে পারি না। তাদের একথা উল্লেখ না করেই পরবর্তী আয়াতসমূহে তার জবাব দেয়া হচ্ছে। (তারা যে ধরনের মু'জিযা দেখানোর দাবি করতো তার কয়েকটি নমুনার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, হূদ, টীকা ১৩; আল হিজর, টীকা ৪ ও ৫; বনী ইসরাঈল, টীকা ১০৫ ও ১০৬ ও আল ফুরকান, টীকা ৩৩)

১০৮. অর্থাৎ কোন নবীই নিজের ইচ্ছা মত কখনো কোন মু'জিযা দেখাননি। তাছাড়া নিজের পক্ষ থেকে মু'জিযা দেখানোর ক্ষমতাও কোন নবীর নেই। কোন নবীর মাধ্যমে

মু'জিযা কেবল তখনই প্রকাশ পেয়েছে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে কোন অবাধ্য কওমকে দেখাতে চেয়েছেন। এটা কাফেরদের দাবির প্রথম জবাব।

১০৯. অর্থাৎ খেল-তামাসা হিসেবে কখনো মু'জিযা দেখানো হয়নি! মু'জিযা তো একটি সিদ্ধান্ত সূচক জিনিস। তা প্রকাশ পাওয়ার পরও কোন কওম যখন মানে না তখন তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তোমরা শুধু তামাশা দেখার জন্য মু'জিযা দাবী করছো। কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো না যে, এভাবে দাবীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনছো। এটা কাফেরদের এ ধরনের দাবীর দ্বিতীয় জবাব। ইতিপূর্বে কুরআনের কয়েকটি স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর, টীকা ৫ ও ৩০; বনী ইসরাঈল, টীকা ৬৮ ও ৬৯; আল আম্বিয়া, টীকা ৭ ও ৮; আল ফুরকান, টীকা ৩৩ ও আশ শু'আরা, টীকা ৪৯)।

১১০. অর্থাৎ তোমরা যদি শুধু তামাশা দেখা ও মনের আনন্দের জন্য মু'জিযার দাবী করে থাকো অর্থাৎ এতোটুকু নিশ্চিত হওয়া তোমাদের প্রয়োজন হয়ে থাকে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কথা মানার জন্য তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন তা সত্য কিনা তাহলে আল্লাহর যেসব নিদর্শনাবলী তোমরা সর্বদা অবলোকন করছো এবং তোমাদের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হচ্ছে সেগুলোই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। প্রকৃত সত্য বুঝার জন্য এসব নিদর্শনের বর্তমানে আর কোন নিদর্শনের কি প্রয়োজন থাকতে পারে। এটা মু'জিযা দাবী করার প্রেক্ষিতে তৃতীয় জবাব। কুরআন মজীদের কতিপয় স্থানে এ জবাবটিও ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমরা ভালভাবে এর ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ২৬ ও ২৭; ইউনুস, টীকা ১০৫; আর রা'দ, টীকা ১৫ থেকে ২০; আশ শু'আরা, টীকা ৩, ৪ ও ৫)।

পৃথিবীতে যেসব জন্তু মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছে তার মধ্যে বিশেষ করে আছে গরু, মোষ, ভেড়া, বকরী, উট ও ঘোড়া। এসব জন্তুর সৃষ্টিকর্তা এমন নকশা অনুসারে এদের সৃষ্টি করেছেন যে, এসব অতি সহজেই মানুষের পোষ মানা সেবকে পরিণত হয়ে যায় এবং তাদের সাহায্যে মানুষের অসংখ্য প্রয়োজন পূরণ হয়। মানুষ এসবের ওপর আরোহণ করে, এসবকে ভার বহন করার কাজে লাগায়, ক্ষেত, কৃষি ও ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে, এর দুধ দোহন করে পান করে আবার তা দিয়ে লাচ্ছি, মাখন, ঘি, দধি, পনির এবং নানা রকমের মিষ্টি তৈরী করে। এর গোশত খায় এবং চর্বি ব্যবহার করে। এর পশম, লোম, চামড়া, নাড়িভুঁড়ি, হাড্ডি, রক্ত, গোবর তথা প্রতিটি জিনিস তার কাজে লাগে। এটা কি সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, মানুষের সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে তাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার এ অসংখ্য প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে একটি বিশেষ পরিকল্পনাধীনে এ জন্তুটিকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে?

তাছাড়া পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ পানি এবং এক চতুর্থাংশ স্থলভাগ। স্থলভাগেরও বহু সংখ্যক ছোট বড় অঞ্চলের মধ্যে জলভাগ অবস্থিত। পৃথিবী গ্রহের এসব স্থলভাগে মানব বসতির বিস্তার এবং তাদের মাঝে পর্যটন ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া আদৌ সম্ভব হতো না যদি পানি, সমুদ্র ও বাতাসকে এমন নিয়ম-বিধির অধীন না করা হতো যার কারণে নৌ-পরিবহন করা সম্ভব হয়েছে এবং এমন সব উপায় উপকরণ সৃষ্টি করা

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

সুতরাং এরা কি[১১১] এ পৃথিবীতে বিচরণ করেনি, তাহলে এরা এদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি দেখতে পেত? তারা সংখ্যায় এদের চেয়ে বেশী ছিল, এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং পৃথিবীর বুকে এদের চেয়ে অধিক জাঁকালো নিদর্শন রেখে গেছে। তারা যা অর্জন করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত তাদের কাজে লাগেনি। তাদের রসূল যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন তখন তারা নিজের কাছে বিদ্যমান জ্ঞান নিয়েই মগ্ন ছিল[১১২] এবং যে জিনিস নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো সে জিনিসের আবর্তেই তারা পড়ে গিয়েছিলো। তারা যখন আমার আযাব দেখতে পেল তখন চিৎকার করে বলে উঠলো, আমরা এক ও লা-শরীক আল্লাহকে মেনে নিলাম। আর যেসব উপাস্যদের আমরা শরীক করতাম তাদের অস্বীকার করলাম। কিন্তু আমার আযাব দেখার পর তাদের ঈমান গ্রহণ কোন উপকারে আসার নয়। কারণ, এটাই আল্লাহর সুনির্ধারিত বিধান যা সবসময় তাঁর বান্দাদের মধ্যে চালু ছিল।[১১৩] সে সময় কাফেররা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

না হতো যা ব্যবহার করে মানুষ জাহাজ নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। এটা কি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, এক সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও মহাজ্ঞানী প্রভু আছেন যিনি মানুষ, পৃথিবী, পানি, সমুদ্র, বাতাস এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত জিনিসকে তাঁর নিজের বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি করেছেন? এমনকি মানুষ যদি শুধু নৌপরিবহনের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করে তাহলে নক্ষত্রসমূহের অবস্থান এবং গ্রহসমূহের নিয়মিত আবর্তন থেকে এ ক্ষেত্রে যে সাহায্য পাওয়া যায় তা প্রমাণ করে যে, শুধু পৃথিবী নয়, মহানুভব সে প্রভু আসমানসমূহেরও স্রষ্টা।

তাছাড়া এ বিষয়টিও একটু ভেবে দেখুন, যে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর এ অসংখ্য জিনিস মানুষের কর্তৃত্বাধীনে দিয়ে রেখেছেন এবং তার কল্যাণের জন্য এসব সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন, জ্ঞান ও চেতনা সুস্থ থাকলে আপনি কি তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করতে পারেন যে, সে আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ) এমন নির্বোধ যে, তিনি মানুষকে এসব দিয়েছেন কিন্তু কখনো তার হিসেব নেবেন না?

১১১. এটা সমাপ্তিসূচক বাক্য। এ অংশ পাঠ করার সময় ৪, ৫ ও ২১ আয়াত ক'টি আরেকবার দেখে নিন।

১১২. অর্থাৎ নিজেদের দর্শন ও বিজ্ঞান, নিজেদের পার্থিব জ্ঞান–বিজ্ঞান, নেতাদের মনগড়া ধর্মীয় কিস্‌সা কাহিনী (Mythology) এবং ধর্মীয় বিধি–বিধানকেই (Theology) তারা প্রকৃত জ্ঞান মনে করেছে এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আনীত জ্ঞানকে হীন ও নগণ্য মনে করে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করেনি।

১১৩. আল্লাহর আযাব কিংবা মৃত্যুর মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্তই কেবল তাওবা ও ঈমান উপকারে আসে। আযাব এসে পড়া বা মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর ঈমান আনা কিংবা তাওবা করা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।